সরল কৃষি-কথা

বাংলার শাকসব্জী, গো-সেবা, বাংলার মাটি, তূলার চাষ, কলার চাষ, ইক্ষু চাষ, ফসলের খাদ্য, মৎস্য বিজ্ঞান, আলুর চাষ, কৃষি পঞ্জিকা বহু প্রভৃতি কৃষিগ্রন্থ প্রণেতা।

ডাঃ (যামিনীরঞ্জন) মজুমদার
প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান—

এম, এল, দে এণ্ড কোং,
৬৬।৬৭ কলেজ ষ্ট্রীট,

দে এণ্ড কোং
২৫।২৬ ক্যানিং ষ্ট্রীট

কলিকাতা

[মূল্য চারি আনা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীনিতাই পদ বসু
হিন্দুস্থান এজেন্সী,
৯ নং ক্লাইভ রো,
কলিকাতা।

১৩৩৩ ১ম সং—২০০০
১৩৩৪ ২য় সং—২০০০
১৩৩৫ ৩য় সং—৫০০০
১৩৩৬ ৪র্থ সং—৫০০০
১৩৩৭ ৫ম সং—৫০০০
১৩৩৮ ৬ষ্ঠ সং—৫০০০
১৩৩৯ ৭ম সং—১০০০
১৩৪০ ৮ম সং—১০০০
১৩৪১ ৯ম সং—১১০০

নবম সংস্করণ

Printed at Garob Ptg. Wks. 2|1 Mitra Lane, Cal.

সূচী

বাংলার কৃষির উপযোগিতা।

সুজলা সুফলা এই বাংলা দেশ আমাদের মাতৃভূমি। এই দেশের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এজন্য বাংলা দেশকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হইয়া থাকে। সমগ্র বাংলা দেশে জমীর পরিমাণ মোট ৬২৬৮৫০০০০ একর। তাহার মধ্যে ২৭০১৩৫০০০ একর জমীতে চাষ আবাদ হইয়া থাকে, ৫২৩৬৩০০০ একর জমীতে বনজঙ্গল আছে, ১৫১১৭১০০০ একর জমীতে রাস্তাঘাট আছে, উহা ছাড়া এখনও এ দেশে আবাদ হইতে পারে অথচ অনাবাদী ১৫১১৭৩০০০ একর জমী আছে। বাংলা দেশের অধিকাংশ অঞ্চল নদীমাতৃক এজন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অল্লায়াসে এখানে অধিক ফসল পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট কৃষির যথেষ্ট আদর ও সম্মান ছিল তাঁহারা কৃষি কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক বৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে এদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক কৃষি কার্য্যকে হীন বৃত্তি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই আদর্শ এই মনোবৃত্তি সমাজের অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ক্রমশঃ অল্লাধিক প্রবেশলাভ করিতেছে; তাহার ফলে কৃষকের পুত্র সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিলে আর তাহার পৈত্রিক কৃষিকার্য্য করিতে চাহে না বরং স্বল্প বেতনের একটী চাকরী পাইবার

আশায় বৃথা লালায়িত হইয়া বেড়ায়—দেশে আজকাল এরূপ দৃষ্টান্তে অভাব নাই। ইহা দেশের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়াই আমার মনে হয়।

কৃষিকার্য্য, হীন বৃত্তি—যাঁহাদের এরূপ ধারণা আছে তাঁহাদের নিকট আমার বক্তব্য এই যে, যেসকল কার্য্যের দ্বারা ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে যাহা না করিলে সংসার, সমাজ, সভ্যতা এক কথায় সব কিছুরই অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইতে পারে তাহাকে কি প্রকারে হীন বৃত্তি বলা যাইতে পারে? বরং তাহাকে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলাই সঙ্গত নহে কি? প্রাচীনকালে কৃষিকে যে এদেশে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক বৃত্তি বলিয়া বিবেচনা করা হইত তাহার প্রমাণ—বৈদিক যুগে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ স্বহস্তে হালচালনা করিয়া কৃষি কার্য্য করিতেন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আমরা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাই। এই কৃষি শাস্ত্র বেদ, উপনিষদের ন্যায় প্রাচীন ঋষিদের মস্তিষ্ক নিঃসৃত জ্ঞানরাশি। আমাদের পরাশর সংহিতা একখানি প্রাচীন কৃষিশাস্ত্র, কেদারকল্প, তরু চিকিৎসা প্রভৃতি কৃষিশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। প্রাচীন ঋষি বিশ্বামিত্র এক বৃক্ষলতার সঙ্গে অপর বৃক্ষলতার, একপ্রকার ফুল ফলের সহিত অন্য প্রকার ফুল ফলের, এক প্রকার জীবজন্তুর সহিত অন্য প্রকার জীব জন্তুর বর্ণ শঙ্কর উৎপাদন করাইয়া জগতে দ্বিতীয় স্রষ্টা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঋষি বাৎসায়ন তাঁহার কাম বিজ্ঞানে—কন্যাকাল অধ্যায়ে একখানি ছোট খাট

সবজী চাষের অবতারণা করিয়াছেন—এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

কার্য্যকারী দিক দিয়াও আমরা প্রাচীন ভারতে বিরাটের উত্তর গো-গৃহে, নন্দের নবলক্ষ ধেনু, শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ, অর্জ্জুনের খাণ্ডবদাহন, বলরামের নাম ইত্যাদিতে কৃষিকার্য্যেরই অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। কবি কৃত্তিবাসের কৃপায় রাজর্ষি জনক বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। জনকের কন্যা ছিলেন সীতা, সীতা ছিলেন অযোনি সম্ভবা ; আমরা পুরাণে দেখিতে পাই—রাজা জনক স্বহস্তে হল কর্ষণ করিতে করিতে কর্ষিত ক্ষেত্রের সীতার মধ্যে, কন্যা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। সীতা শব্দের অন্য অর্থ লক্ষ্মী। জনক রাজর্ষি তাই তিনি ভূমি কর্ষণ করিয়া—কৃষিকর্ম্ম করিয়া পুণ্যতমা লক্ষ্মীকে পাইয়াছিলেন সীতারূপে—কন্যারূপে। এই দৃষ্টান্তে আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থ রামায়ণ প্রণেতা ঋষি আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, হে ভারত কৃষিকর্ম্ম কর, যুগে যুগে সীতা জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদের গৃহে গৃহে ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবে।

এই সকল হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে কৃষির কিরূপ সমাদর ছিল। তাহার পরবর্ত্তী কালেও যে ভারতে কৃষির আদর ও চর্চ্চা ছিল খনার বচন হইতেই আমরা তাহার প্রমাণ পাই। এই কৃষির সেবা করিয়া ভারত অনতিকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ধনধান্য সুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল কিন্তু যে দিন হইতে আমরা এই কৃষিকে অবজ্ঞা

ও অনাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছি সেই দিন হইতেই আমাদের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে।

ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ প্রধানতঃ শিল্পপ্রধান থাকিলেও বর্ত্তমান যুগে তথাকার অধিবাসীরা কৃষির উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়া নূতন উন্নত প্রণালীর সময় ও শ্রম লাঘবকারী কৃষি যন্ত্রাদি সাহায্যে, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগে ও সাধারণের মধ্যে আধুনিক কালোপযোগী উন্নত প্রণালীর কৃষি বিষয়ক জ্ঞান বিস্তার করাইয়া, কৃষি কর্ম্ম দ্বারা তথাকার কঙ্করবহুল ভূমিতে আমাদের দেশের চাইতে বহুগুণ বেশী ফসল উৎপাদন করিয়া দিন দিন লক্ষ্মীলাভ করিতেছে আর আমরা এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশ চির কৃষি প্রধান হওয়া সত্বেও সময়োপযোগী কৃষি বিষয়ক জ্ঞান প্রচার অভাবে ও কার্য্যকারী সকল বিষয়ে আমাদের নিশ্চেষ্টতার জন্য আমরা দিন দিনই দরিদ্র হইয়া পরিতেছি।

তাই যে কৃষি ভারতের যুগযুগান্তরের সাধনার বস্তু ছিল আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্য দিয়া সেই কৃষি সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চাই। দেশে এখনও পতিত, জঙ্গল, জলা, অনাবাদী জমী বিস্তর পড়িয়া আছে, সেই সকল জমী লইয়া যদি উদ্যোগী যুবকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কো-অপারেটিভ প্রণালীতে আমার পরামর্শানুযায়ী স্বহস্তে কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে ইহা কিরূপ লাভজনক কার্য্য। ধান, পাট ব্যতীতও এমন কতকগুলি কৃষি আছে

যাহা অল্প মূল ধনে, অল্প জমীতে, অল্প লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে ইংরাজীতে তাহাকে Intensive agriculture বলা হয়, বাংলায় আমরা উহাকে সংক্ষেপে আয়কর কৃষি এই আখ্যা দিতে পারি। এইরূপ কয়েকটী কৃষির ইঙ্গিতেও আমি এই পুস্তক মধ্যে দিয়াছি।

ইহা ব্যতীত বাংলায় প্রতি পল্লীতে বনে জঙ্গলে এমন কতকগুলি অনায়াসলভ্য গাছপালা জন্মায় যাহার সদ্ব্যবহার করিলে আমরা অতি অল্পায়াসে প্রচুর লাভবান হইতে পারি, তাহারও কিছু কিছু পরিচয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেওয়া গেল। যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা কৃষির প্রতি বাংলার যুবকদের দৃষ্টি কিঞ্চিন্মাত্রও আকৃষ্ট হয় তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকার উপযোগী ফসল

১। প্রস্তরময় মৃত্তিকার উপযোগী—যই, জুয়া, ভুট্টা, গোঁদলী, লাইও, মাড়ুয়া, কোদো, বাজ্‌রা বাঁশ, কোঙ্গা, খাম-আলু, চুবড়ি-আলু, শঠী, রেড়ী, সিমুলআলু তুঁত, লঙ্কা, টেঁপারি, তামাক, রাঙ্গা ও সাদা আলু, শাঁকআলু কাঁক্‌রোল, চিচিঙ্গা, কুন্দরুকি, বর্ব্বটী, ঘোড়ামুগ, অড়হর, নীল সজ্‌না, অড়হরিয়া সীম, পলাশ, আসন, মাখম সীম, সয়বীন্ নামক জাপানী সীম, সোরগোঁজা, মেস্তাপাট, কর্পাস, সিমুল, মেস্তা, ঢেঁড়স, কুসুম, ফাপর বা রাজগীর, ভেলা, সাবুই ঘাস,

হরিতকী, সিঙ্কোনা গাছ, চা, কফি, তেজপাতা, ডেঙ্গোশাক, হিজ্‌লী বাদাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি।

২। বালুকাময় জমীর উপযোগী—বাজরা তিল, সোরাগোঁজা, কলাই, মগ, যব, যই, সর্ষপ, ধইঞ্চা, চীনা বাদাম, কাপর, শন, চীনা, ফুটী, তরমুজ, খরমুজ, পটোল, শাঁক আলু, কুলত্থ-কলাই, নীল, মেস্তাপাট, কুসুম , ভাতুই, ধান ইত্যাদি।

৩। দোআঁশ জমীর উপযোগী—আলু তামাক, ধান, পাট, ইক্ষু, বিলাতী ও দেশী সব্‌জী, ভুট্টা, গম, যব, তিসি, যই, ছোলা, মটর, মুসুরী, খেঁসারী, মুগ কলাই, জুয়ার, কার্পাস, মেস্তা, হলুদ, আদা, আমাদা, এরোরুট, চীনাবাদাম, ফুটী, তুঁত, সিমুল আলু, সাদা ও রাঙ্গাআলু, ওল, কচু, মান, চুবড়ি ও খাম আলু ইত্যাদি।

৪। কর্দ্দমময় মৃত্তিকার উপযোগী—আমন ধান, গম, পাট ইক্ষু, অড়হর মাতুরকাঠি, তুত, ছোলা, মটর, সীম, মুগ, তিসি, বাঁধাকপি, যই ইত্যাদি।

৫। ঘুটিং, শামুক, বা চুনে-পাথর সঙ্কুল, মৃত্তিকার উপযোগী—ধান, অড়হর, গম ছোলা, খেঁসারী, মসুরি, যব, আলু, শাক আলু, ভুট্টা, জুয়ার, বাজরা, যই, লুসার্ণ, অড়হরিয়া সীম, কুলথ কলাই ইত্যাদি।

৬। উদ্ভিজ্জ পদার্থ ঘটিত মৃত্তিকা বা বোদ্‌মাটির উপযোগী—লাউ, কুমড়া

ঝিঙ্গা শশা তিসি, সর্ষপ, যই, যব, গম, বেগুন, ঢেড়শ্ ইত্যাদি

৭। সমুদ্রকূল হইতে ৫০।৬০ ক্রোশের মধ্যে জন্মাইবার উপযুক্ত ফসল।—ধনে মূলা, বাঁধাকপি, হিজলীবাদাম, খর্জ্জুর, সুপারি, নারিকেল, ইক্ষু ধইঞ্চা, আলু, চীনাবাদাম, কার্পাস, কলা, লাউ, কুমড়া যব, ইত্যাদি।

মৃত্তিকার অবস্থান ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপরই শস্যোৎপাদন নির্ভর করে। নিম্নকর্দ্দমময় ভূমি আমনধানের উপযোগী কিন্তু মাদুরকাঠি বা তুত নিম্ন ভূমিতে লাগাইলে হইবে না; হিজলীবাদাম বা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রস্তরময় জমিতেই ভাল জন্মে; সমুদ্র হইতে শতাধিক ক্রোশ অন্তরে ইহা ভাল জন্মে না। তেজ-পাতার গাছ প্রস্তরময় ভূভাগে উত্তম জন্মাইতে পারা যায় বলিয়া যে মানভূম বা সিংভূমে ইহা ভাল জন্মিবে এরূপ কথা নাই কারণ যে স্থানে বৃষ্টিপাত পরিমাণে কম সে স্থানে এ গাছ ভাল জন্মে না। সুতরাং কেবল মৃত্তিকার উপাদান দেখিয়াই ফসল নির্ব্বাচন করা চলিতে পারে না।

বাংলার কয়েকটি ফসল।

ঘাস জাতীয়—ধান, গম, যব, যই, ভূট্টা, বাজরা, মারুয়া চীনা, কাওন, শ্যামা, কুতকি, কোদো, আখ, বাঁশ ইত্যাদি।

নানারকম ঘাস—দুর্ব্বা, গিনিঘাস, পারঘাস, লেবুঘাস, রোড়স্‌ঘাস, হাতীঘাস, রিয়নঘাস. সুদানঘাস ইত্যাদি।

সীম জাতীয়—মটর মুসুরী, মুগ, খেসারী, কলাই বুট বা ছোলা, অড়হর, শণ, ধইঞ্চা ইত্যাদি।

শর্ষেজাতীয়—শরিষা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, ওলকপি, মূলা প্রভৃতি।

সুত্রজাতীয়—কার্পাস, সিমুল, মেস্তা পাট, অম্বরি লতা, কস্তুরী, ঢেড়স ইত্যাদি।

উপারাক্ত ফসলের মধ্যে কতকগুলি আমাদের নিত্য ব্যবহারিকগণ মধ্যে পরিণত করা যায় যথা—

১। খাদ্য শস্য—ধান, গম, যব, যই, ভুট্টা, জুয়ার ইত্যাদি

২। ডাইল শস্য—মুসুরী, খেঁসারী, মটর, ছোলা, অরহর, বর্ব্বটী, মুগ, মটর, কলাই প্রভৃতি।

৩। তৈল শস্য—শর্ষে, তিল, রাই, তিল, শোরগুজা, রেড়ি, চিনাবাদাম, ইত্যাদি।

৪। তন্তু শস্য—পাট, শন, কার্পাস, মেস্তা, মুর্গা, শিমূল প্রভৃতি।

৫। জমীর নীচে উৎপন্ন ফসল—আলু, আদা, হলুদ, শঠি, এরোরুট, নানারকম মেটে আলু, ওলকপি, মূলা, পিয়াজ, রশুন, বীট, শালগম ইত্যাদি।

৬। দেশীয় শাক সবজী—কুমড়া, বেগুন, লাউ, পটোল, ঝিঙা, শশা, উচ্ছে, ঢেড়স, সীম, ডুমুর, কচু, ওল, চিচিঙ্গা ইত্যাদি।

৭। বিদেশীয় সবজী—ফুল ও বাঁধাকপি, বিলাতী বেগুণ, বীট, বিন, গাজর, হাতিচাক, শালগম প্রভৃতি।

৮। মসলা জাতীয় শস্য— শর্ষে, ধনে, লঙ্কা, জীরা, মেথী, রাধুনী মৌরী, তেজপাতা, আদা, হলুদ, রশুন, পুদিনা, শুলকা প্রভৃতি।

৯। শাক জাতীয় শস্য—পালং, বেথা, হিংচা, ডেঙ্গা, নটে, লালশাক, পুঁই ইত্যাদি।

১০। শর্করা জাতীয় শস্য—আঁখ, তাল, বীট, খেজুরগাছ প্রভৃতি।

১১। ঔষধ ও মাদকজাতীয় গাছ—পান, তামাক, গাঁজা, সিদ্ধি, আফিং, সিনকোনা, কোকো, কফি, চা ইত্যাদি।

১২। পশু খাদ্য—ভূট্টা, যই, মটর, জোয়ার, খেঁসারী, কালই, নানারকম ঘাস, লুসার্ণ, সয়বীন, চিনাবাদাম, বড়সীম, নীম, বরবটী প্রভৃতি।

১৩। রংয়ের গাছ—নীল, পলাস, বাবলা, কুসুমফুল, মেহেন্দি, নটকান, জাফরান, ইত্যাদি।

১৪। ফল জাতীয়—আম, কাঁটাল, আনারস, কলা, পেয়ারা, জাম, গোলাপজাম, লিচু, পেঁপে, জামরুল, আতা, কমলালেবু, লেবু, সপেতা, তরমুজ, ফুটী, ক্ষীরা, বেদানা, লিচু, আঙ্গুর, নারিকেল, বেল, কুল প্রভৃতি।

১৫। কাঠের গাছ—দেবদারু, মেহাগ্নি, খয়ের, সেগুন, শাল, ইত্যাদি।

ধান্য।

বৈদিক যুগে কেবলমাত্র ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই ধান্য পরিচিত ছিল না। ধান্য এই সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধাংশ লোকের প্রধান খাদ্য। আমাদের এই জীবন-স্বরূপ ধান্যের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ধান্য সর্ব্বপ্রথমে চীন দেশেই নীত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই চীনে ধান্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন চীন সম্রাট রিয়ান ধান্যোৎসব-প্রথা প্রবর্ত্তণ করেন। ঐ উৎসবে স্বয়ং সম্রাট্ সর্ব্বপ্রথম স্বহস্তে এক বিশিষ্ট প্রকার ধান্য বপন করেন। সেই হইতেই উক্ত প্রথানুযায়ী প্রতি বৎসরই চীন-সম্রাট্ স্বহস্তে সাগ্রহে ধান্য-বীজ বপন করেন এবং তৎপরেই কৃষকেরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে ধান্য বপন করেন। তৎকাল হইতেই চীনের প্রায় সর্ব্বত্রই ধান্যের চাষ চলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ৪৭২১ বৎসর পূর্ব্বে তণ্ডুলই চীনবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল।

বাংলা দেশে প্রধান ফসলই ধান। ইহা অনুমান ৫০০০ রকম আছে। এই ৫০০০ রকম ধান্যকে ৫ ভাগ করা যাইতে পারে যথা—(১) আমন (২) আউস (৩) দিগে, (৪) বোরো (৫) রায়দা। ইহাদের কোন সময় কোন ধান্য বপন করিতে

হয় কতটুকু জল দিতে হয়, কতটুকু সার দিতে হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

আমন ধান অনেক রকমের আছে, যথা—ইন্দ্রশহল, নাগরা, দুধসর ইত্যাদি—ইহা ধানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা অনেক রকমের আছে। দিনাজপুরে কাটারি ভোগ খুবই উৎকৃষ্ট ধান। সবগুলি স্থানীয় জল বাতাসের সাহায্যে উৎপন্ন হয়। কোন কোন স্থানে ইহা অন্য জমিতে প্রথমে বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ারী করিয়া পরে রোপণ করিতে হয়। আবার কোন কোন স্থানে জমিতে আবাদ করার পরে বীজ বপন করিয়া দেওয়া হয়। এক কাঠা পমিাণ জমিতে ৫।৬ সের বীজ বুনিলে যে চারা হইবে তাহাতে এক বিঘা রোপণ করা যাইবে। একটা মাটির পাত্রে বীজগুলি ১০।১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া পরে সেগুলি তুলিয়া জল ঝাড়িয়া বাতাসে শুকাইয়া দরমা ঢাকা দিয়া রাখিলে বীজ ফুটিয়া বাহির হইবে। এই ফুটন্ত বীজ কাদা মাটীতে বৈশাখ মাসে ছিটাইয়া দিবে। পরে সেখান হইতে আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে উঠাইয়া ভাল করিয়া তৈয়ারী জমির মাটিতে রোপণ করিবে। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে এই ধান্য পাকিয়া থাকে। হেমন্ত ঋতুতে পাকে বলিয়া উহাকে হৈমন্তিক ধান্য বলে

ছিটাইয়া বোনার জমি বৈশাখ মাসে বৃষ্টির পর ভাল করিয়া তৈয়ারী করিয়া বিঘা প্রতি /১ সের বীজ বুনিতে হয়। পরে নিড়াইয়া দিতে হয়। আমণ ধানের পক্ষে নাইট্রোজেন ও

ফস্ফরিক খুব উপকারী। গোবরের সারও অনেক জমিতে দেওয়া যায়। বেশী নাইট্রোজেন দিলে গাছ খুব ঝাড়াল হয় কিন্তু ধান কম হয়। নাট্রোজেনের সঙ্গে কিছু ফস্ফরিক এসিড দিলে ধান বেশী হয়। প্রতি বিঘায় ৩০।৪০ মণ গোবর সার দিতে হয়। প্রতি বিঘায় ১০/ মণ ধান হইতে পারে।

আউশ ধান্য—কটকতারা, সূর্য্যমুখী, লুকি, গরকা, তুলসী-মালা, বেণীভাঙ্গা ইত্যাদি অনেক রকম আছে—দোয়াশ বা তার চেয়ে হালকা মাটীতে ইহা ভাল জন্মে। সাধারণতঃ বীজ ছিটাইয়া বপন করা হয় কিন্তু আমন ধানের মত যদি ইহার বীজ তলায় লাগাইয়া পরে রোপণ করা হয় তবে ফসল খুব বেশী হয়। শীতের প্রথমেই গভীর করিয়া চাষ দিয়া চৈত্র কি বৈশাখ মাসে বতর পাইলে বীজ ছিটাইয়া দিবে। বিঘা প্রতি বার তের সের কিংবা হিসাব করিয়া বুনিতে পারিলে দশ সের বুনিলেও ভাল ফসল হয়। আউশ ধানে বেশী সার দেওয়া সঙ্গত নয়।

বিঘা প্রতি দুই গাড়ী গোবর সার দিলেই যথেষ্ট। গাছগুলি বিঘত আন্দাজ বড় হইলে হয় রেড়ীর খইলের গুঁড়া একমণ কিংবা সালফেট অব এমোনিয়া দশ সেরের সঙ্গে সুপার ফস্ফেট বার সের মিশাইয়া জমিতে ভাল করিয়া সমান ভাবে ছিটাইয়া দিতে হয়। ঢাকার দিকে লাল মাটীতে গোবর সারের সঙ্গে প্রতি বিঘায় এক মণ হাড়ের গুঁড়া দেওয়ায় ভাল ফসল হইয়াছে।

সাধারণতঃ আউশ ধান ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকে। বেশী পাকিবার পূর্ব্বেই এই ধান কাটা উচিত নইলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

বোরো ঃ—খুব জলা জায়গা ভিন্ন এ ধান হয় না। নদীর কিনারা বিলের পাশে বা ভিজা চরে সাধারণতঃ এই ধান ভাল হয়। জোয়ার ভাটার সাহায্যেই এই ধান আবাদ হয়। প্রথমে যে স্থানে বর্ষার জল নামিয়া গিয়াছে সেই স্থানে কাদার উপর গজান বীজ বুনিতে হয়। তুই কাঠা জমিতে পাঁচ সের বীজ বুনিলে এক বিঘা জমির চারা যথেষ্ট হয়। বীজ তলায় মাঝে মাঝে জল দিতে হয়। চারাগুলি পৌষ মাঘ মাসে দশ বার ইঞ্চি লম্বা হইলে জমিতে রোপন করিতে হয়। বোরা জমির চাষের ও সারের কোন আবশ্যক হয় না। কাদার উপরেই সাধারণতঃ চারাগুলি লাগান হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ধান কাটা হয়। প্রতি বিঘায় সাত আট মন ধান পাওয়া যায়।

রায়দা ধান—বোরো ধানেরই একটা অংশ। বোরো ধানের বীজের সঙ্গে ইহাও অঙ্কুরিত করিয়া লাগান হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে বোরোধান কাটা হইলে ইহা জমিতে থাকে, পরে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহা কাটা হয়। ইহার গাছ খুব লম্বা হয়, এই জন্যই বেশী জলেও ইহা জন্মিয়া থাকে। ইহা প্রতি বিঘায় পাঁচ ছয় মণ উৎপন্ন হয়।

দিঘা—ইহাও চৈত্র মাসে জমিতে বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। জমিতে ভাল করিয়া চাষ মই দিয়া জো মত

ইহার বীজ ছিটাইাইতে হয়। পরে ইহা নিড়ানের আবশ্যক হয়। সারের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। তবে আমন ধানের জমির মত ঐরূপে ইহাতে সার দেওয়া যাইতে পারে। ইহা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কাটিতে হয়। প্রতি বিঘায় সাত আট মণ ধান হয়।

ঢাকা, বরিশাল, চুচুড়া ও বাঁকুড়ায় অবস্থিত সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্রের গবেষণার ফলে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ধান্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেয় ফলন খুব বেশী এবং ইহাদের চাষে কৃষকগণ অধিক লাভবান হইবে ঃ—

(ক) **শালিধান্য**।

ঢাকা নং ১—**ইন্দ্রশাইল**—মাঝারি রকমের রোয়া ধান, সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাকে। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের যে সকল জমি উর্ব্বর ও যাহাতে নভেম্বর পর্য্যন্ত রস থাকে সেই জমির পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা ভাওয়ালের নিচু বাইদ জমিতেই উৎকৃষ্ট ফলে। উচ্চ জমি অর্থাৎ যেখানে কাত্তিক শাইল জাতীয় ধান উৎপন্ন হয় কিম্বা দোফসলি জমি ইহার আবাদের পক্ষে উপযোগী নয়।

উপযুক্ত আবহাওয়ায় এই ধান শাইল ধান অপেক্ষা বিঘা প্রতি ১/ মণ বেশী ফলে।

ঢাকা নং ২—**দুধসর**। অধিকাংশেই এই ধান উপরোক্ত ১নং থানের মত কেবলমাত্র ইহা ১নং ধান অপেক্ষা ৮।১০ দিন পূর্ব্বে পাকে। সুতরাং ইহা ১নং ধানের উপযোগী জমি হইতে

অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি ও হালকা জমিতে ভাল হয় এবং অধিক ফলে।

ঢাকা নং ১৫—**ঝিঙ্গাশাইল**। ইহা ১নং ও ২নং ধান অপেক্ষা মিহি; ইহার ডগায় সামান্য সোঁয়া আছে। একই রকম অবস্থায় ইহা ২নং ধানের সঙ্গে সঙ্গেই পাকে ও সমান ফলে। ১নং ২নং ধান অপেক্ষা ইহার চাউল ভাল। ইহার খড় অতি নরম। কাজেই অতি সহজেই এই ধানের ঝাড় শুইয়া পড়ে। ইহা এবং উপরোক্ত দুই রকম ধানই স্থানীয় ধান অপেক্ষা সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১/ মণ বেশী ফলে।

ঢাকা নং১৬—**লাটিশাইল**। ইহা একপ্রকার মোটা শাইল ধান। ২নং ধানের সঙ্গে ইহাও পাকে। ১নং, ২নং ও ৩নং ধানের উপযোগী জমিতে ইহার আবাদ চলে, কিন্তু ঐ সকল জমি অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক উঁচু জমিতেই ইহার ফসল ভাল হয়, ইহার গাছ লম্বা হয় না। দোফসলি জমির জন্য ও মোটা অথচ প্রচুর ফসলেচ্ছুক ব্যক্তির জন্য এই ধান অনুমোদন করা যাইতে পারে।

ঢাকা নং ২১—শঙ্কর জাতীয় শালি ধান্যের মধ্যে ইহা আগে পাকে ও ডি× আই (৩৪) নামে পরিচিত। ইহা উৎকৃষ্টতর ধান্য, ও মাঝামাঝি জমিতে ভাল ফসল দেয়।

চুচুড়া নং ২—**নাগরা**। ইহা পশ্চিমবঙ্গের নাগরা ধানেরই একটী নির্ব্বাচিত জাত। ১নং ধানের জমিই ইহার চাষের উপযোগী। ইহার ফলনও প্রচুর।

চুচুড়া নং ২—**ভাসামানিক**। ইহা পশ্চিমবঙ্গের একটী নির্ব্বাচিত জাত। পাঁচ বছরের গড়পড়তা ফলনে ইহা চুচুড়া সরকারী ক্ষেত্রের অন্যান্য সকল ধানকেই পরাস্ত করিয়াছে। সম্প্রতি ইহার সুখ্যাতি বাঙ্গালার সমস্ত জায়গায়ই শুনা যাইতেছে। গুণ ও ফলন এই দুয়ের সমন্বয়ে ইহা আদর্শ ধান।

বাঁকুড়া নং ১—বাদকলমকাটী।.(৬৫) ইহা বাঁকুড়া জিলায় কার্ত্তিক শাইল শ্রেণীভুক্ত **বাদকলমকাটি** ধান্যেরই একটী নির্ব্বাচিত জাত। ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ধান্য ও আগে পাকে। বাঁকুড়া ও বীরভুম অঞ্চলে উঁচু "বাদ ভূমিতে ইহার ফলন এত বেশী যে তথায় ইহার সমকক্ষ অন্য কোন ধান্যই নাই।

(৯) বরিশাল নং ১—**চিংড়িঘুষি** (৫)। বরিশালের চিংড়িঘুষি বালাম ধানের ইহা একটি উন্নত জাত। স্থানীয় বালামের জমিই ইহার চাষের উপযোগী।

(১০) বরিশাল নং ২—**ক্ষীরাজলি**। বরিশালের ক্ষীরাজলি বালামেরই ইহা একটি উন্নত জাত। বাখরগঞ্জে ইহার চাষ ও ফলন ঠিক ৯নং ধানের অনুরূপ।

(খ) আশুধান্য :

(১১) ঢাকা নং ২—**কটকতারা**। ইহা মাঝারিগোছের মিহি ধান। সাধারণতঃ ইহা ৪মাসে পাকে। ইহা উঁচু জমীতে ছিটকাইয়া বোনা হয়। ইহা উঁচু উর্ব্বর জমিতে কোন রবি-শস্যের সহিত পাল্টাপাল্টি ভাবে ভাল হয়। মধুপুর জঙ্গল

অঞ্চলের উঁচু জমিতে ইহার ফলন ভাল হয়। ইহা দেরীতে পাকে বলিয়া দোফসলি ধান জমির উপযোগী নহে। তবে শীঘ্র প্যাকে এমন কোন শাইল ধান ইহাতে লাগান যাইতে পারে।

(১২) ঢাকা নং ৪—**সূর্য্যমুখী**। সকলাংশেই উহা কটক-তারার মত।

(১৩) ঢাকা নং ৩ **চারণক**। উহা উঁচু ও হাল্‌কা জমির উপযোগী আশুধান। চারণক্ খুব চিক্কণ এবং কটকতারা ও সূর্য্যমুখী ধানের আগে পাকে। ফলন ও চাউলের চিক্কণতা হিসাবে উহা একটী উৎকৃষ্ট ধান।

(১৪) ঢাকা নং ১৪—**ধারিয়াল**। ইহা এক প্রকার মোটা আশুধান্য। ১১নং ধানের মত ইহা আগে পাকে। ১১নং, ১২নং ধানের জমিও ইহার উপযোগী। উহার ফলন খুব বেশী এই কারণে চাষীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য ইহা খুব পছন্দ করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের যে যে অঞ্চলে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই ইহা অতি উৎকৃষ্ট ফলন দিয়াছে।

(১৫) ঢাকা নং১৬—**কুমারী**। ইহা মাঝারিগোছের মিহি ধান। ১১নং, ১২নং ধানের জমিই ইহার উপযোগী।

(১৬) ঢাকা নং ১৮—ইহা শঙ্কর জাতীয় আউস ধান ও পি×এস্ (৮) নামে পরিচিত। ইহা আগে প্যাকে। উঁচু, উর্ব্বর অথচ হাল্‌কা ও দোফসলি ধান জমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

(১৭) বাঁকুড়া নং ২—**ঝাঁজি** (৩৪)। বাঁকুড়ার অবিমিশ্র আশু-রোয়া ধান হইতে ইহা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহা মোটা ও প্রচুর পরিমাণে ফলে। উঁচু রোয়া ধানের জমিই ইহার আবাদের উপযোগী।

(১৮) বাঁকুড়া নং ৪—**ভূতমুড়ি** (৩৬)। বাঁকুড়ার ভূতমুড়ি আউস ধানের ইহা একটি উন্নত জাত। ইহা উঁচু জমির উপযোগী ধান। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা অনাবৃষ্টিও সহ্য করিতে পারে। খুব মোটা চাউল বলিয়া চাষী ও শ্রমজীবীরা ইহা খুব পছন্দ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত সকল জাতীয় ধানই ফলন ও গুণের জন্য চাষের উপযোগী। উপযুক্ত আবহাওয়ায় এই সকল ধানের ফসল চাষীদিগের ধান অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে।

বীজ বিতরণ প্রণালী

নানা কারণে বীজ বিতরণ কার্য্য একটি সমস্যার কথা, যথা—

(১) চাষীরা সাধারণতঃ তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরাই রাখে। প্রতি বৎসরই তাহাদিগকে বাহির হইতে বীজ আনিতে হয় না। অতএব পাটের ন্যায় বীজ আনিতে হয় না। অতএব পাটের ন্যায় বীজ ধানের কোন নির্দ্দিষ্ট চাহিদা নাই।

(২) চাষীরা সাধারণতঃ গুণ অবস্থা নির্ব্বিশেষে ২।৩ রকম

জাতের ধান বুনিয়া থাকে। অতএব অনেক জায়গা ব্যাপিয়া কেবলমাত্র একই রকমের ধান বিতরণ করা সম্ভবপর নয়। ঐ কারণেই বীজ ধান মিশ্রিত হইয়া যায় ও ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

(৩) পাটের বীজ অপেক্ষা ধানের বীজ দরে সস্তা ও আকারে বড় বলিয়া দূরদেশে সরবরাহ করার খরচ পোষায় না। রেলভাড়া প্রভৃতি খরচ অনেক বেশী হইয়া পড়ে।

যদি গ্রাম্য কৃষি সমিতি, জিলা বোর্ড, কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক বা স্থানীয় মাতব্বর চাষীদের দ্বারায় গ্রামের বীজ ক্ষেত্র (Seed Centres) স্থাপিত হয় তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান সহজেই হইতে পারে। এই সকল বীজক্ষেত্র সরকারী কৃষিক্ষেত্র হইতে বীজ লইবে এবং উহা হইতে বীজ উৎপন্ন করিয়া পর বৎসর বুনিবার আগে পর্য্যন্ত গোলাজাত রাখিবে, পরে প্রতিবেশীদিগের নিকট উহা বিক্রয় করিবে কিম্বা স্থানীয় বীজের বদলে দিবে। যদি বদলে দিতেই হয় তাহা হইলে আর গোলাজাত করিবার প্রয়োজন হয় না, একেবারেই শস্য কাটিবার পর ক্ষেত্র হইতেই বিতরণ করা যাইতে পারে।

এই ব্যবস্থানুযায়ী ১৯২৫ সাল হইতে কার্য্য হইয়াছে এবং ১৯৩১-৩২ সালে এইরূপ বীজ ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৪৫ উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে ১২৯টির প্রত্যেকটির আয়তন ৫ বিঘার বেশী এই সকল বীজক্ষেত্র হইতে ১৯৩১-৩২ সনে মোট ১৩৮১৮/ মণ আউস ও আমন বীজ ধান বিতরণ করা হইয়াছে।

বীজ সংরক্ষণই চাষীদের পক্ষে প্রধান সমস্যা। যতটুকু বীজ স্থানীয় চাষীদের কেবলমাত্র বুনিবার জন্য প্রয়োজন ততটুকু পর বৎসর বুনিবার আগে পর্য্যন্ত গোলাজাত রাখিতে হইবে, নতুবা বীজ ধান অন্যভাবে খরচ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সাধারণ চাষীরা ইহা করিতে পারে না। আশা করা যায়, সরকারী সমবায় বিভাগ (Co-operative Department) চাষীদের এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২।১ জায়গায় সমবায় বিভাগ স্থানীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে সরকারী বীজ তাহাদের মেম্বরদের মধ্যে বিতরণ ও পরে সমগ্র বীজ গোলাজাত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে বীজ ক্রয় করিয়া এই সর্ত্তে বিতরণ করে যে, প্রত্যেক গ্রাহক ফসল কাটিবার পর কম পরিমাণ ধান উপরন্তু আরও সিকি অংশ ফেরত দিবে। এই সমস্ত বীজ ব্যাঙ্ক মজুত করিয়া পুনরায় একই সর্ত্তে পর বৎসর বিতরণ করে কিংবা বিক্রয় করে। এইরূপ ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জ এবং রাজসাহীর নওগাঁও এলাকায় আউস ধান ও বগুড়ায় আমন ধান লইয়া চলিতেছে। যতদূর সম্ভব সমবায় বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের সহযোগে বীজক্ষেত্র স্থাপিত হওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা বীজক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত বীজসমূহ পর বৎসর বুনাকাল পর্য্যন্ত যাহাতে গোলাজাত থাকে, তাহার সুবন্দোবস্ত নিকটবর্ত্তী ব্যাঙ্কসমূহের সাহায্যে করাইয়া দিতে পারিবেন।

উপরোক্ত বিভিন্ন জাতীয় ধান সম্বন্ধে কিম্বা সরবরাহের নিমিত্ত বীজ উৎপন্ন করা সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষ বিবরণ জানিতে চান, তাহা হইলে ঢাকায় বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট কিংবা সরকারী কৃষিফারমে উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ মহাশয়ের নিকট আবেদন করুন।

পাট

বাংলাদেশে পাট একটা প্রধান সম্পদ। প্রায় পঁয়ষট্টি কোটী টাকা বৈদেশিক অর্থ আমরা ইহার দ্বারা প্রাপ্ত হই।

সাধারণতঃ ইহা দুই প্রকারের, গোলাজাতীয় তিতা আর লম্বা জাতীয় মিঠা পাট। মিঠা পাটের চেয়ে তিতা পাটের তন্তু ভাল। মিঠা পাট উঁচু ডাঙ্গা জমিতে আর তিতা পাট নিচু বা জলা জমিতে হয়।

অনেক রকম বীজ পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষিবিভাগের বীজই সবচেয়ে ভাল, তিতার মধ্যে কাকিয়া বোম্বাই যাহা নিম্নজমিতে বা জলাজমিতে হয়, মিঠার মধ্যে চুচুড়া সবুজ যাহা উঁচুজমিতে হয় ইহাই সবচেয়ে ভাল। অন্যান্য পাটের চেয়ে ইহা প্রায় দুই মণ বিঘাতে বেশী হয়। কাকিয়া বোম্বাই উজ্জ্বল সাদা। এতে ডালপালা কম হয়, ছোট থাকিতে কাটিলে ওজন কম হয়. কিন্তু সেগুলি রেশমের মত কোমল হয়, বাংলাদেশের লক্ষাধিক বিঘা ইহার চাষ হয়। বাংলাদেশের সমস্ত স্থানের চেয়ে সাধারণতঃ পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি জমিতে ভাল পাট হয়। এঁটেল মাটিতে পাট বেশী হইলেও তন্তু কম হয়। যখন বাড়ীতে থাকে তখন যথেষ্ট জল ও উত্তাপের দরকার। গোড়াতে পাটে বেশী বৃষ্টি পাইলে পাট খারাপ হয়।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে নীচু পাটের জমিতে চাষ দিতে

হয়। খুব ভাল চাষ ও মই দিয়া জমি তৈরী করিতে হয়। পাট সকল উঠিয়া গেলেই চাষ দিতে হয়। যে জমিতে প্রত্যেক বৎসর পলি পড়ে না তাহাতে প্রতি বিঘায় ৩।৪ গাড়ী গোবর সার দিবে। যে সমস্ত আগাছা ও কচুরী ইত্যাদি যাহা জমিতে থাকে তাহা পোড়াইয়া সেই ছাই জমিতে দিবে। কচুরী পোড়াইয়া তাহার ছাই যথেষ্ট পরিমাণ দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। জমির অবস্থা বুঝিয়া মাঘ ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত বীজ বোনা হয়। প্রতি বিঘায় এক সের দেড় সের বীজ বপন করিতে হয়। পাট বোনার পর বৃষ্টি হইয়া যদি জমির মাটীতে সরালী পড়ে তবে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

পাটের গাছগুলি বিঘত পরিমাণ বড় হইলেই ৪।৫ ইঞ্চি তফাৎ রাখিয়া আর উঠাইয়া ফেলিবে। আর যদি পাট বেশী পাত্‌লা হয় তবে ডালও বেশী হয়।

পাট বুনিবার চার পাঁচ মাস পরে পাট কাটিবার মত হয়। শুকাইয়া যখন ফল বাঁধিতে আরম্ভ হয় তখন ইহা কাটার উপযুক্ত সময়। দেরি করিয়া কাটিলে পাটের ওজন বেশী হয় কিন্তু তাহা শক্ত আর খারাপ হয়।

পাট কাটিয়া ছোট আঁটী বাঁধিয়া ৩।৪ দিন জমিতে রাখার পর পাতা ঝরিলে জলে ভিজাইতে হয়। স্রোতের জলে না ভিজাইয়া বদ্ধ জলেই ভিজান ভাল। উপরে কাদা, কলাগাছ ইত্যাদির চাপ দিয়া অন্ততঃ ২ ফুট নীচে রাখিতে হয়। ইহা

বেশী পচাইলে খারাপ হয়। পচান শেষ হইলে আঁশ ছাড়াইয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

সাধারণতঃ প্রতি বিঘায় সাত আট মণ হয় কিন্তু ভাল বীজ বুনিয়া ভাল ভাবে সার দিলে দশ বার মণও হয়।

ডাইল।

ডাইল শুটি জাতীয় (Leguminous) ফসল সুতরাং অন্যান্য শুটিজাতীয় ফসলের মত সূর্য্যকিরণ হইতে নাইট্রোজেন নামক আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। ডাইলের চাষে সারের বিশেষ কোন আবশ্যক হয় না। যে জমিতে ডাইলের চাষ করা হয় সে জমিতে সামান্য চূণ ও নাইট্রোজেন প্রধান সার থাকিলেই হইল, না থাকিলে সামান্য দেওয়া আবশ্যক। ডাইলের মধ্যে মটর, ছোলা, মুগ, অড়হর, খেঁসারী, ও মুসুরী প্রধান।

মটর—কার্ত্তিক মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৭।৮ সের বীজ লাগে। বীজ ছিটাইয়া ও লাইন করিয়া জুলিতে লাগান হয়। ৪।৫ ইঞ্চি অন্তর বীজ ও ৩ ফিট অন্তর গাছের লাইন রাখা আবশ্যক। এঁটেল বা পলি মাটি ইহার পক্ষে উপযুক্ত।

ছোলা—বীজ বপনের সময় কার্ত্তিক মাস। বিঘা প্রতি ১২।১৩ সের বীজ লাগে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল কাটা হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ৩/০ মণ ডাইল আর ৫।৬/০ সের বিচালী পাওয়া যায়। সরল এঁটেল মাটি ইহার চাষের বিশেষ উপযোগী।

মুগ—ইহা দুই প্রকারের কৃষ্ণমুগ ও সোণামুগ। কৃষ্ণমুগের বীজ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ও সোণামুগের বীজ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বপন করিতে হয়। প্রতি বিঘায় /২ সের বীজ লাগে এবং ৪।৪॥০/০ মণ ডাইল পাওয়া যায়। কৃষ্ণমুগ আশ্বিন মাসে ও সোণামুগ মাঘ ফাল্গুনে কাটা হয়। ইহার পক্ষে দোঁয়াশ মাটি উপযুক্ত।

অড়হর—ইহার দুই জাতি আছে (১) জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বপন করিয়া মাঘ ফাল্গুনে ফসল তোলা হয় এবং (২) শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বপন করিয়া চৈত্র মাসে তোলা হয়। বিঘা প্রতি ৩।৪/০ মণ ডাল পাওয়া যায়। ইহার চাষের পক্ষে দোঁয়াশ এঁটেল মাটিই উপযুক্ত। অড়হরের চাষে জমি উর্ব্বর হয়। কাটা গাছগুলি জ্বালানির পক্ষে ভাল। কুমিল্লার অড়হরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

খেঁসারী—আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বিঘা প্রতি /৩ সের বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ২/ মণ ডাল ও ৩/ বিচালী পাওয়া যায়।

মুসুরী—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বীজ ছিটাইয়া বপন করা হয়। বিঘা প্রতি /২॥০ সের বীজ লাগে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল পাকে। বিঘা প্রতি পাঁচ মণ ডাইল পাওয়া যায় বাংলায় বরিশালের মুসুরী উৎকৃষ্ট।

মাত্র কয়েকটী প্রধান ডাইলের এখানে উল্লেখ করিলাম

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার ডাইল আছে—যথা কুলত্তি বা কুলথ, বিরী কলাই, বরবটি, গাড়ী কলাই, সয়বিন, মাসকলাই ইত্যাদি ("বাংলার ফসল" দ্রষ্টব্য)।

আলু।

আলু নানাবিধ—শকরকন্দ আলু, রাঙা আলু, শাঁক আলু, মউ আলু, চুপড়ী আলু, ইত্যাদি অনেক প্রকার আলু আছে, তন্মধ্যে গোল আলু বা বিলাতি আলু সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক। বঙ্গদেশে অতি অল্প স্থলেই আলুর আবাদ হইতেছে, তন্মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম পারেই অধিক।

কঠিন জমিতে আলুর আবাদ হয় না এবং লৌহ বা পাথরসংযুক্ত মৃত্তিকাও আলুর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সূক্ষ্ম বালুকাযুক্ত দোঁয়াশ আল্‌গা মৃত্তিকা আলুর আবাদের পক্ষে প্রশস্ত। জমি এরূপ হইবে যেন জল অধিক্ষণ দাঁড়াইতে না পারে, জল থাকিলে আলু পচিয়া যায় কিন্তু তাই বলিয়া একে-বারে ঢালু জমি ভাল নহে। জমির নিকট নদী, পুষ্করিণী, খাল ও বিল কিম্বা ইন্দারা থাকা আবশ্যক।

জমি হইতে ভাদুই ফসল উঠিয়া গেলে ঘন ঘন চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষা অন্তে, আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত আলু রোপণ করা যাইতে পারে।

আলু রোপণের একমাস পূর্ব্বে জমি চাষ করা উচিত। আলুর জমি ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হইবে। মাঘ ফাল্গুন মাসে ফসল ভাল হয়। আলুর জমিতে নাইট্রোজেন, পটাস,

গ্রহণোপযোগী ফসফারিক অ্যাসিড, অস্থিচূর্ণ, রেড়ীর খইল, ছাই, গোবর সার এই সমস্ত সার দেওয়া যাইতে পারে। এক বিঘা জমিতে আলু চাষেয় আয় ব্যয়।

জমির খাজনা ৩৲	বীজ আলুর দাম ২০৲
চাষ দেওয়া ৮ বার ৪৲	সারে খরচ ২৫৲
মই দেওয়া চারবার ৪৲	মোট খরচ ৬০৲

জল সেচন ৮ বার ৪৲

অন্যূন ৮০ মণ আলু হইলে ৩৲ হিঃ ২৪০৲ টাকা, নিড়ান ২ বার ৫৲ টাকা, খরচাদি বাদ ১৭৫৲টাকা নগদ লাভ।

ইহাতে সংক্ষেপে কেবলমাত্র গোল আলুর সম্বন্ধে কিছু বর্ণিত হইল, বেশী জানিতে ইচ্ছা করিলে মৎপ্রণীত ‘আলুর চাষ’ পড়িলে অধিক জানিতে পারিবেন।

চিনাবাদামের চাষ।

বাঙ্গলাদেশে চীনাবাদামের চাষ অল্পই হয়। অথচ অর্থ করী ফসল হিসাবে ইহা বেশ লাভজনক হইবার সম্ভাবনা। রবি ও খরিফ উভয় খন্দেই ইহার চাষ হইতে পারে। বাঙ্গলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় দশ হাজার মণ চীনাবাদাম বাহির হইতে আমদানী হয়। বর্ত্তমানে চীনাবাদামের ব্যবহার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং সকল স্থানেই উহা সহজেই বিক্রয় হয়। চীনাবাদাম হইতে তৈল বাহির করিবার প্রথা এখনও এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই পৃথিবীর সকল স্থানেই খাইবার তৈল হিসাবে ইহার চাহিদা থাকায়, বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সময় অন্যান্য ফসলের মূল্য পড়িয়া গেলেও, চীনাবাদামের মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস হয় নাই।

চীনাবাদামের ডগা, গো-খাদ্য হিসাবে খুবই ভাল। ইহা বড় অথবা বিল-ঘাস হইতেও অধিক পুষ্টিকর। বাদাম কাঁচা কিম্বা ভাজিয়া উভয় প্রকারেই খাওয়া যাইতে পারে। ইহার তৈল রান্নায়, সাবান প্রস্তুতের জন্য এবং মেসিনের তৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার খৈল অতি পুষ্টিকর এবং গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে। শীম জাতীয় গাছের মধ্যে চীনাবাদামের গাছের ন্যায় অন্য কোন গাছ এত অধিক কাজে আসে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

চীনাবাদামের মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি আছে। ইহার মধ্যে একপ্রকার বীজাণু বাস করে। এই বীজাণু বায়ু হইতে গাছের প্রধান খাদ্য সোরাজান সংগ্রহ করিয়া মাটীতে জমা করে এবং তাহাতে জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়।

বৎসরে ২ বার চাষ করা যায় বর্ষার পূর্ব্বে এবং বর্ষার পর। পূর্ব্ব বাংলার বালী পড়া মাটীতে কার্ত্তিক মাসে জল শুকাইয়া গেলে ঘন ঘন ৩।৪ বার চাষ দিয়া বিঘা প্রতি ॥/ অর্দ্ধ মণ বীজ খোষা শুন্য বাদাম পীনি বা লাইন করিয়া লাগাইতে হয় ১০০ দিন পরে উত্তোলন করা যায় ও পরে সেই জমিতে ধান পাট বপন চলে। আর উঁচু জমিতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে এ প্রকারে লাগাইতে হয়। ইহার সার পচা গোবর ও চিনা বাদামের খৈল অভাবে রেড়ীর খৈল। বিঘা প্রতি ১৭/ মণ বাদাম হয় দাম অন্যূন ১০৲ দশ টাকা হিসাবে হইলেও ১৭০৲ টাকা পাওয়া যায়, খরচ বেশী হয় না।

বিভিন্ন জাতীয় চীনাবাদাম :—

সচরাচর নানাপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় চীনাবাদাম দেখা যায়। তাদের মধ্যে কতকগুলি অতি শীঘ্রই তৈয়ারী হয় এবং কতক পাকিতে অতি দীর্ঘ সময় নেয়। কোন জাতীয় চিনা-বাদামের বীজ অতিশয় ছোট এবং কোন জাতীয় চীনাবাদামের বীজ বেশ বড়। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ রবিতে "আশুস্পেনিস" চীনাবাদাম এবং এক প্রকার আশু চীনাবাদাম এবং খরিফে

"বড় একোলা" এবং "ছোট জাপান" নামক চীনাবাদাম বপন করিতে অনুমোদন করেন।

বিভিন্ন জাতীয় চীনাবাদামের বর্ণনা—

১। "স্পেনিস্ চীনাবাদাম"।—ইহা অতি আশু ফলপ্রদ কিন্তু বাদাম অতি ছোট। এই চীনাবাদামের গাছ ঠিক সোজা-ভাবে মাটীর উপর থাকে না। ইঁহা হাল্কা জমিতে চাষের উপযুক্ত।

২। "ছোট জাপান"।—ইহা মাঝারি আকারের চীনা-বাদাম, কিন্তু বাদাম ছোট এই চীনাবাদামের গাছ কতকটা সোজাভাবে মাটীর উপর থাকে। ইহা সাধারণতঃ অস্ফীত জমিতে ভাল হয়।

৩। "একোলা নং ১০"।—এই জাতীয় চীনাবাদাম অত্যন্ত দেরীতে পাকে, কিন্তু বাদাম খুব বড় হয়। ইহার চাষ সর্ব্বত্রই করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশের অনেক জমিই এই চীনা-বাদাম চাষের উপযুক্ত এবং ইহার ফলনও অন্যান্য বাদামের তুলনায় অত্যন্ত অধিক।

বাৎসরিক ২০ ইঞ্চি হইতে ১০০ ইঞ্চি পরিমিত বৃষ্টিপাতের মধ্যে চীনাবাদামের চাষ করা চলে। বাঙ্গলাদেশে প্রত্যেক জেলাতেই চীনাবাদাম চাষ করা যাইতে পারে।

চীনাবাদাম অধিক পরিমাণে বৃষ্টির জল সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য যে জমিতে চীনাবাদাম চাষ করা হয়, তাহা

হইতে অতি সহজেই জল সরিয়া যাইতে পারে কিনা সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নীচু এবং শক্ত জমিতে চীনাবাদামের চাষ করা উচিত নহে। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে পাহাড়ের গায়ে বালু জমিতে চীনাবাদামের চাষ করিয়া অত্যন্ত ভাল ফলন পাওয়া গিয়াছে।

জমি তৈয়ারী এবং সার প্রয়োগের উপকারিতা ঃ—

ঝুর ঝুরে বেলে মাটীতেই চীনাবাদামের চাষ ভাল হয়। কারণ ইহার স্থুটি মাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই বাড়িতে থাকে। সুতরাং মাটী যদি বেশ আল্‌গা না থাকে, তবে বাদামের আকার অত্যন্ত ছোট হয় এবং ফলনও কমিয়া যায়। খুব গভীর ভাবে চাষ করা সেইজন্য একান্ত দরকার। বেলে অথবা দোয়াশ মাটী চীনাবাদাম চাষের জন্য বাছিয়া লওয়া উচিত। রবিখন্দের জন্য যে সকল জমিতে যথেষ্ট রস আছে এবং খরিফ খন্দের জন্য যে সকল জমিতে জল আদৌ দাঁড়ায় না, সহজেই সরিয়া যায়, সেই সকল জমিই চীনাবাদাম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বেলে জমিতে সার দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে। জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতার উপর সার দেওয়া নির্ভর করে। সমস্ত জমির পক্ষেই গোবর উপকারী, কিন্তু পটাস ক্ষার যাহা কাঠের ছাইতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহা চীনাবাদামের পক্ষে প্রকৃত প্রয়োজনীয়। জ্বালানি কাঠ পোড়াইয়া কিম্বা টাগই (Water-hyacinth) পোড়াইয়া সেই ছাই প্রয়োগ

করা যাইতে পারে। কেবল অম্লযুক্ত জমিতে চূণ দেওয়া দরকার হয।

বপন প্রণালী ঃ—

খরিফ খন্দের জন্য মে, জুন অথবা জুলাই মাসে যখনই জমি প্রস্তুত হয় এবং বীজ অঙ্কুরিত হইবার মত জমিতে যথেষ্ট রস থাকে, তখনই চীনাবাদাম লাগাইবার প্রকৃত সময়। রবি খন্দে জমির প্রকৃতি বুঝিয়া ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত বপন চলিতে পারে। কিন্তু এই খন্দে জমি প্রস্তুত হইবামাত্র যত শীঘ্র পারা যায়, উঁচু জমিতে এবং চর জমিতে চীনাবাদাম বপন করিয়া ফেলা উচিত।

চীনাবাদাম লাগাইবার পূর্ব্বে খোসা ছাড়াইয়া নিতে হইবে। ইহা নিজ হাতেই বেশ দক্ষতার সহিত করিতে পারা যায়। নূতন খোসা ছাড়ান বীজ ব্যবহার করা উচিত, কারণ ইহা সর্ব্বদাই ভাল ফল দেয়।

লতান গাছের বীজ দুই হইতে আড়াই ফুট অন্তর এবং সোজা গাছের বীজ ১৮ ইঞ্চি হইতে ২০ ইঞ্চি অন্তর লাগাইতে হইবে। প্রত্যেক লাইনের মাঝখানে প্রায় ১২ ইঞ্চি করিয়া জায়গা রাখা দরকার। প্রথমে ৬ ইঞ্চি অন্তর বীজ পুতিয়া পরে অঙ্কুর বাহির হইলে চারা তুলিয়া মাঝখানে ১২ ইঞ্চি ফাঁক করিয়া দিলে ভাল হয়।

জমির প্রকৃতি বুঝিয়া বিভিন্ন প্রকার চীনাবাদামের বীজ কম বেশী করিয়া বপন করা উচিৎ। আকার এবং প্রকার

ভেদে সাধারণতঃ প্রতি বিঘাতে সাত সের হইতে দশ সের পর্য্যন্ত ছাড়ান বীজের প্রয়োজন হইতে পারে।

যদি জমিতে যথেষ্ট রস থাকে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই অঙ্কুর মাটির উপর দেখা দেয়। ইহার পর চারাগুলি অতি সত্বর বাড়িতে থাকে। অতএব অঙ্কুরিত হইবার দুই তিন সপ্তাহ পরেই একবার গোড়া ভাল করিয়া খোঁচাইয়া দেওয়া দরকার। গাছগুলি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনবার জমি ভাল করিয়া কোদ্‌লাইয়া দিতে হইবে। ইহা কোদালি কিংবা "প্লেনেট জুনিয়ায় হ্যাণ্ড হো" দ্বারা করা যাইতে পারে। যতদিন গাছ সকল বাড়িতে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত জমি পরিষ্কার এবং জমি আল্‌গা রাখিতে হইবে।

বাদাম তুলিবার প্রণালী ঃ—

কোন্ সময় বাদাম তুলিতে হইবে, ইহা ঠিকমত নির্দ্ধারণ করা অতিশয় দরকার ; কারণ আশুজাত বাদাম সাড়ে তিন মাস হইতে চারি মাসের মধ্যেই পাকিয়া যায়, যে বাদাম বিলম্বে পাকে তাহা তুলিতে পাঁচ ছয় মাস অপেক্ষা করিতে হয়। বাদাম যখন তুলিবার উপযুক্ত হয়, তখন গাছের পাতা সকল হলদে হইয়া কোকড়াইতে আরম্ভ করে এবং খোসার ভিতর শাসে পূর্ণ হয়, প্রতি একরে ১৮ হইতে ২০ মণ বাদাম আশা করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

খুব শীঘ্র বাদাম তুলিলে ওজনে অত্যন্ত কম পাওয়া যায়। সেই জন্য শীঘ্র বাদাম না তুলিয়া বিলম্ব করাই শ্রেয়ঃ। চীনাবাদাম তুলিবার পর খোসাশুদ্ধ খুব ভাল করিয়া রৌদ্রে শুকান দরকার। কারণ তাহা না হইলে বাদাম নষ্ট হইয়া যায়।

উই এবং ইঁদুর এই ফসলের বিশেষভাবে ক্ষতি করে। জলসেচন দ্বারা ইহাদের আক্রমণ কমান যাইতে পারে। বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে উইকে নির্ম্মূল করা যায় এবং বিষ প্রয়োগে ইঁদুর মারিয়া ফেলা যায়। কিন্তু এই সকল সচরাচর ব্যবহার করিবার সুযোগ ঘটে না। যতদূর সম্ভব যে সকল জমিতে উঁই কিংবা ইঁদুরের উপদ্রব নাই সেই সমস্ত জমিই চীনাবাদাম চাষের জন্য বাছিয়া লওয়া উচিত।

চীনা বাদামের বীজ মধ্যপ্রদেশ কিংবা মাদ্রাজ হইতে আনান যাইতে পারে। যদি ঠিক সময়ে খবর পাওয়া যায়—যেমন রবির জন্য আগষ্ট মাসে এবং খরিফের জন্য অক্টোবর মাসে—তাহা হইলে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ উপযুক্ত বীজ সরবরাহ করিয়া দিতে পারে। বীজের মূল্য বাজার দর অনুযায়ী প্রতি মণ সচরাচর ৭৷৷০ আনা হইতে ১০৲ টাকার মধ্যে পড়িতে পারে।

ইক্ষু।

ইক্ষু চাষের পক্ষে প্রচুর রৌদ্র তাপ এবং আর্দ্র বায়ু এই দুইটী বিশেষ উপযোগী। বাংলাদেশে এই দুইটির অভাব নাই সুতরাং বাংলায় ইক্ষুচাষ ,ভালই হইতে পারে। বর্ত্তমানে বাংলায় অনেক স্থানেই ইক্ষুচাষ হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃই ইক্ষুচাষের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে দেখা যাইতেছে সুতরাং ইক্ষুকেও এখন এদেশের একটী প্রধান ফসল বলা যাইতে পারে। ইক্ষু হইতে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য গুর ও চিনি প্রস্তুত হয়। স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে, উপকারিতায় সর্ব্ববিষয়েই ইক্ষুগুড় ও ইক্ষুচিনি, অন্য সকল প্রকার গুড় ও চিনি হইতে উৎকৃষ্ট। ইক্ষু বহু জাতিয় আছে তন্মধ্যে এদেশে সামশাড়া, কাজলা, খাড়ি, পুড়ী, বোম্বাই, ট্যানা প্রভৃতি জাতীয় ইক্ষুর আবাদ হইতে দেখা যায়। সামশাড়া, কাজলা ও খাড়ি জাতীয় ইক্ষুই বাংলা দেশে বেশী লাগান হয় এবং উহার আবাদও এখানে বেশ ভাল হয়। ইহারা উচ্চ দোয়াঁশ জমীতেই ভাল জন্মে, গাছ ৫।৬ হাত লম্বা হয়, রসে মিষ্টতাও অন্যান্য ইক্ষু হইতে অধিক থাকে। সামশাড়া আঁখে বিঘা প্রতি ৬০ মণ পর্য্যন্ত গুড় হইতেও দেখা গিয়াছে। কাজলা ও খাড়ি জাতীয় আঁখে বিঘা প্রতি ১৫।২০ মণ গুড় পাওয়া যায়।

আর বাংলার সরকারী কৃষি বিভাগের যে সি-ও ২১৩,

বি-১৪৭ বি-২০৮ জাতীয় ইক্ষু আছে উহাও এদেশে বেশ ভাল হয়। উহার মধ্যে সি-ও-২১৩ আখই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহা মাঝারি সরু আঁখ, লালচে কটা রং, গুড় খুব উৎকৃষ্ট এবং পরিমাণেও বেশী হয়। ইহার প্রধান গুণ, যেমন বেশী সবল তেমনি ইহা হাজা শুখা খুব সহ্য করিতে পারে এজন্য ইহাকে সকল দিক দিয়াই ভাল বলা চলে। কৃষি বিভাগে বি-১৪৭ আঁখও খুব ভাল আঁখ ইহা চিবাইয়া খাওয়া বা গুড় করা উভয় দিকেই ভাল; ইহা উত্তর বঙ্গে খুব ভাল জন্মে। ইহার দোষের মধ্যে ইহাতে পোকা লাগে আর বেশী দিন চাষের পর খারাপ হইয়া যায়। আর বি-২০৮ আঁখ ইহাও মন্দ নহে ইহা খুব নরম এজন্য চিবাইয়া খাওয়ার উপযুক্ত আঁখ কিন্তু বেশী নরম বলিয়া একটু বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে এই ইহার প্রধান দোষ, ইহার চাষ সমুদ্র তীরবর্ত্তী অঞ্চলে খুব ভাল হয়।

ইক্ষু চাষ প্রাণালী ঃ—জাতিভেদে ইক্ষু চাষ, সকল প্রকার জমীর উপযোগী হইলেও উচ্চ অথচ সরস ও অত্যন্ত উর্ব্বরা দোআঁস জমীতেই ইক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জন্মে। শুষ্ক, কঠিন এবং বালি শূন্য এঁটেল মাটীতে ভাল হয় না। ইক্ষুর জমি সর্ব্বদা সরস থাকা আবশ্যক, যেন কোন মতে শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া না যায়। ইক্ষুর জন্য নির্ব্বাচিত জমি, বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রতি মাসে একবার করিয়া চাষ দেওয়ার পরে, জমীতে সার দিয়া অগ্রহায়ণের শেষ পর্য্যন্ত আরও ৪।৫টী গভীর চাষ দিয়া জমী সমতল ও ধূলিবৎ করিয়া ফেলিতে হয়।

ইক্ষুর জমীতে প্রচুর সার দিতে পারিলে ভাল হয়; বিঘা প্রতি ৬।৭ মণ ছাই ও ৭০।৮০ মণ গোবর সার বা রেড়ী ও সরিষার খৈল ২৫ মণ বা হাড়ের গুড়া ১০ মণ বা সোরা ৫।৬ মণ ইহার যে কোন সার দিলেই চলিতে পারে উহাতে উৎকৃষ্ট ফসল আশা করা যায়। ইক্ষুক্ষেত্রে সমুদয় সার এক সঙ্গে দিতে হয় না; আশ্বিনের শেষে অৰ্দ্ধেক পরিমাণ পরে ইক্ষু রোপণের সময় হইতে বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমে বাকী অর্দ্ধেক সার দিয়া দিতে হয়। এ দেশের কোন কোন জেলায় বিনা সারেও ইক্ষু চাষ হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে ফসল ভাল হয় না।

মাঘ মাসের শেষাশেষি একটু গরম বোধ হইলেই ক্ষেত্রে ইক্ষু রোপণ করিতে হয়। রোপণ কালে জমী শুষ্ক থাকিলে আবশ্যক মত জল সেচনে উহা সরস করিয়া লওয়া কৰ্ত্তব্য, নচেৎ উহা লাগিয়া চারা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। কোদালী দ্বারা লম্বালম্বী ভাবে দুই হাত অন্তর, মুটম হাত চওড়া ও ৮ ইঞ্চি গভীর নালা কাটিয়া উহার মাটি দুই পাশে উঠাইয়া রাখিতে হয় পরে ঐ নালার মধ্যে উপরোক্ত সার বেশ করিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া দিয়া সিকড় সমেত ফল বাহির হওয়া ইক্ষুখণ্ড, ১৫ ইঞ্চি অন্তর বসাইয়া যে মাটী উভয় পার্শ্বে উঠাইয়া রাখা হইয়াছে তাহাই ৩।৪ ইঞ্চি পুরু করিয়া চাপা দিয়া অল্প দাবিয়া অবশিষ্ট মাটী উভয় নালার মধ্যস্থ ভূমি ভাগে ছড়াইয়া দিতে হয়।

যে সকল জমি সর্ব্বদা সরস ও শিথিল ভাবাপন্ন তাহাতে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সামান্য জল দিতে হয়, অন্য সময় ঐরূপ জমীতে জলের আবশ্যক হয় না কিন্তু যে সকল জমী সেরূপ নহে তাহাতে ভাল সকল জল সেচনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। বারমাস কাল মধ্যে ইক্ষু পরিপক্ক হয়। যত দিন শীত থাকে ততদিন পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট গুড় হয় এজন্য যত আগে ইক্ষু রোপণ করিতে পারা যায় ততই ভাল হয়।

ইক্ষু রোপণের পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় ; বীজ ভাল না হইলে ফসল ভাল হয় না সুতরাং যাহাতে ভাল বীজ পাওয়া যায় সর্ব্বাগ্রে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। সরকারী কৃষি বিভাগে জানাইলে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

ইক্ষু অত্যন্ত রোগপ্রবণ তদ্ব্যতীত ইক্ষুক্ষেত্রে উঁই ও অন্যান্য কীটের উপদ্রবও যথেষ্ট ঘটিতে দেখা যায় এজন্য যদি ইক্ষু রোপণের প্রক্কালেও ৪ সের লবণ আধপোয়া হেনরো (অল্প মূল্যের হিং) ও ২৷৷০ তোলা সেকোঁ বিষ চূর্ণ আবশ্যক মত জলে মিশাইয়া উহাতে ইক্ষুবীজ দণ্ড গুলি কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া রোপণ করা যায় তাহা হইলে অনেক সময় রোগ এবং কীটাদির উপদ্রব নিবারণ হইয়া থাকে।

তামাক।

বাংলা দেশে প্রায় সত্তর লক্ষ বিঘা জমিতে তামাকের চাষ হইয়া থাকে সুতরাং ইহাও এদেশের একটী প্রধান চাষ। উত্তর বঙ্গে রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তামাকের চাষ খুব বেশী হইয়া থাকে এবং সেখানকার তামাকও বেশ ভাল হয়, কিন্তু একটু চেষ্টা ও যত্ন করিলে বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই ভাল তামাকের চাষ করা যাইতে পারে। তামাকের চাষ যথেষ্ট লাভজনক।

তামাক রোপণ প্রণালী ও সময় :—

উচু বেলে দোআঁশ জমীই তামাক চাষের উপযুক্ত। বর্ষার পরে জমীতে গোবর সার ও সবুজ সার (ধঞ্চে, শণ বরবটী ইত্যাদি) ছড়াইয়া দিয়া পরে উত্তম রূপে চাষ দিয়া জমীর মাটী ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণ মাস মধ্যে ঐ জমীতে দেড় হাত অন্তর তামাকের চারা করিলেই হয়, উহার আর অপর কোন তদ্বির করিতে হয় না। মাঘ ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্র হইতে তামাক কাটিয়া হালসী করিয়া রৌদ্রে কয়েকদিন শুকাইতে দিয়া পাতাগুলি ভাল করিয়া শুকাইয়া গেলে তখন হালসী গুটাইয়া চট দিয়া জড়াইয়া ঘরে রাখিতে হয়। একটী লম্বা দড়িতে

তামাকের ডাটাগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বাঁধিয়া রাখাকেই হালসী বাঁধা বলে।

গরু ছাগলে জমিতে গিয়া তামাকের চারা মাড়াইয়া নষ্ট করিতে পারে, এজন্য জমীর চারিধারে অস্থায়ী বেড়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রকার ভেদ—বাংলাদেশে দুইটী বিভিন্ন জাতের তামাক আবাদ হইয়া থাকে। যথাঃ—(১) দেশী (N. Tabacum) এবং (২) মতিহারী (N. Rustica)। দেশী তামাকের চাষ রংপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায় খুব বেশী। উহার মধ্যে (১) ভেঙ্গী, (২) নাওখোল, (৩) গোদরা এবং (৪) বাসদহ এই চারি প্রকার তামাকই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভেঙ্গী ও নাওখোলের নির্ব্বাচিত বিশুদ্ধ বীজ রংপুর সরকারী তামাক ক্ষেত্রে পাওয়া উৎকৃষ্ট ভেঙ্গীর পাতা লম্বায় ২০" ও প্রস্থে ১৮" হইবে এবং নাওখোল লম্বায় ৩৬" ও প্রস্থে ১৮" হয়।

মতিহারীর আর এক নাম বিলাইতি। রংপুর তামাক ক্ষেত্রে যে জাতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে উহার পাতা ১৮" × ১৮" পর্য্যন্ত বড় হয়। অন্যান্য জাতির পাতা ছোট এবং ফলনও অনেক রকম। বিগত কয়েক বৎসরে মতিহারীর চাষ খুব বাড়িয়াছে ; ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে বাংলার সকল জেলায়ই ইহার চাষ হইতে পারে। ইহার পাতা খুব মোটা, এজন্য হুক্কার তামাকের পক্ষে উপযোগী।

া—তামাকের চাষ যে কোন মাটীতে চলে, তবে যে জমিতে বালির ভাগ বেশী এবং জল আদৌ দাঁড়ায় না উহাই প্রশস্ত। নিকৃষ্ট বেলে মাটীতে উত্তমরূপে সার প্রয়োগ করিয়া বেশ ভাল তামাক উৎপাদন করা যায়। এঁটেল মাটীতে তামাকের আবাদ ভাল হয় না।

হাপোর—উচ্চ জমিতে চারিদিকে নালা কাটিয়া ৪ ফুট চওড়া পাটি তৈয়ারী করিয়া বীজ বুনা কর্ত্তব্য। আগষ্ট মাস থেকে জমি তৈরী সুরু করা হয় এবং মাটীর "যো" ঠিক রাখিবার জন্য অনেকবার চাষ দিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩০/০—৩৫/০ মণ গোবর সার দেওয়া উচিৎ। এক তোলা বীজে ১ বিঘা জমি রোপণ করা চলে।

মাটি এমন ভাবে তৈয়ারী করিতে হয় যেন উহার মাঝখান উঁচু ও দুধার গড়ান থাকে, নতুবা বৃষ্টির জল শীঘ্র নামিয়া যাইতে পারে না। বেশী বৃষ্টির সময় বাঁশের খুঁটী পুতিয়া একটী ছপ্পর তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক; অতি বৃষ্টিতে চারাগুলি মরিয়া যায় এবং পুনরায় বীজ বুনিতে হয়, উহাতে ফসল দেরীতে হইবে এবং ফলনও কমিয়া যাইবে।

সার—অধিক সার না দিলে তামাক ভাল জন্মে না। জমির প্রকার ভেদে বিঘা প্রতি ৫৫/০ মণ থেকে ১০০/০ মণ পচা গোবর সার দেওয়া দরকার। বাংলায় সবুজ সারের তত বেশী চলন নাই। রংপুরে সংবৎসরে ভাল তামাকের জমিতে অন্য কোন ফসলের আবাদ করা হয় না; এই সব জমি পতিত

না রাখিয়া সবুজ সারের চাষ করিলে অধিকতর ফলন হইতে পারে। অন্য কোন প্রকার কৃত্রিম সার দিতে ইচ্ছা হইলে জেলার কৃষি কর্ম্মচারীর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিৎ। ভাওয়াল এবং বরেন্দের মাটীতে চূণের সার না দিলে তামাক ভাল হয় না।

আবাদ—ভাদ্র মাস হইতে চাষ আরম্ভ করিতে হয়। এজন্য ১৪।১৫ বার চাষ ও মৈ দিয়া জমি একেবারে ধূলীস্মাৎ করিতে হয় ও আগাছা নষ্ট করিতে হয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে চারা রোপণ করিতে হয়। নীচু জমিতে অগ্রহায়ণ মাসেও মতিহারী তামাক রোপণ করা যাইতে পারে।

সারি করিয়া চারা লাগান উচিৎ। ৩ ফুট অন্তর সারি করিয়া এক এক সারিতে ২—৩ ফুট অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চারা লাগাইবার প্রশস্ত সময়। মাটীতে রস না থাকিলে রোপণের পরে ২।৩ দিন জল দেওয়া আবশ্যক।

৯।১০ দিনে চারাগুলি মাটীতে বসিয়া যাইবে, তখন থেকেই নিড়ানীর কাজ সুরু হয়। লম্বালম্বী এবং এড়োএড়ি হাত লাঙ্গল দিয়া চাষ করিতে হয়। ক্ষেত সব সময় পরিষ্কার আবশ্যক। জমির অবস্থা ভেদে তিনবার নিড়ান দরকার।

আসল মাথা ভাঙ্গা।—একটা গাছে ৯।১০ টার অধিক পাতা রাখিবে না। সব নীচের ৩।৪টী পাতা ফেলিয়া দিতে হয় এবং ফুলের কলি হইবার পূর্ব্বেই গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া

দিতে হয়। ইহাতে বাকী পাতাগুলি মোটা ও বড় হইয়া থাকে। গাছের ডাল বাহির হইলে তাহাও ভাঙ্গিয়া দিলে নিকৃষ্ট পাতাগুলি একটু পুষ্ট হইলে ভাঙ্গিয়া সেগুলি ঘরের কানাচে চালের নীচে রৌদ্র না লাগে এমন জায়গায় ঝুলাইয়া শুকাইবে, ইহাকে বিশপাত বলে।

জল সেচন—সাধারণতঃ আসল মাথা ভাঙ্গার পূর্ব্বে জল সেচনে আবশ্যক হয় না। তারপর ২।৩ টা সেচ লাগে। মাটী বেশী বেলে হইলে সেচ বেশী লাগে। নীচু জমিতে আদৌ সেচ আবশ্যক করে না।

গাছের শত্রু।—গাছের গোড়ায় মাটীর মধ্যে এক প্রকার কীড়া লুকাইয়া থাকে তাহারা অত্যন্ত অনিষ্ট করে। ইহাদিগকে খুজিয়া বাহির করিয়া ফেলা উচিত। এক রকম পর-গাছা তামাক ক্ষেতে জন্মে; উহার নাম ভুলকি (Orobanche) ইহা অত্যন্ত অনিষ্ট করে; ইহাদিগকে সমূলে উৎপাদন করিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিৎ।

পাতা শুকাইবার নিয়ম।—(দেশী তামাক)—মাঘ ফাল্গুন মাসে নীচের পাতাগুলি পুরট হইয়া সরু করে। তখন এইগুলি মোটা এবং আটাযুক্ত হয় এবং উহাদের উপরে তামাটে রংএর দাগ ফুটতে থাকে। পুরট পাতাগুলি বাছিয়া গাছ থেকে একখানা বাঁকাছুরি দিয়া কাটিয়া লইবে। চাষী এই সময় প্রত্যহ সকালে ক্ষেত্রের মধ্যে যাইয়া এইরূপ পাতা সংগ্রহ করে ও ঘরে নিয়া আইসে; পরে চারিটী করিয়া

পাতার বোঁটা একসঙ্গে বাঁধিয়া মাচানে ঝুলাইয়া দেয়। পাতাগুলি যখন প্রায় শুকাইয়া যায় তখন ঘরের ভিতর নিয়া সেইগুলিকে দেওয়ালের গায়ে কিংবা মাচানে ঝুলাইয়া রাখে। এইরূপে দুই মাস শুকাইলে পাতা বিক্রয়ের উপযোগী হয়।

মতিহারী তামাক—মতিহারী তামাকের ব্যবস্থা একটু অন্যরূপ। কাটার পরে পাতাগুলি দিনভোর মাঠে ফেলিয়া শুকাইতে হয়। সন্ধ্যায় সেগুলিকে ঘরে আনা হয় এবং পর দিন সকালে দেশী তামাকের মত ৪টি পাতার ঝুকি বাঁধা হয় এবং এইগুলি একটী মইএর উপর ৬।। ৯।। পুরু করে এমন ভাবে সাজান হইয়া থাকে যে পাতার ডাঁটাগুলি সমস্তই বাহিরে থাকে। এই মইটী প্রত্যহ সকালে রৌদ্রে দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় ঘরে তোলা হয়। ৮।১০ দিন পর পুনর্ব্বার সাজাইয়া দিতে হয় যেন পাতা চাপা লাগিয়া না পচে।

নিকৃষ্ট জাতের মতিহারী তামাকের গাছ খুব ঘন করিয়া ক্ষেতে রোপন করা হয়।

এরোরুটের চাষ।

এরোরুট পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পরিচিত। রুটের পালোই এরোরুট নামে অভিহিত। এই দ্রব্য দেখেন নাই বা আহার করেন নাই এরূপ মনুষ্য অতি বিরল। পীড়িতদের ইহা পথ্য। দুগ্ধের অভাবে শিশুর ইহা খাদ্য। এতদ্ব্যতীত অনেকে ইহার পুডিং আহার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা উত্তম পিষ্টক প্রস্তুত করা যায়। অধুনা অনেক গোয়ালা ক্ষীর প্রস্তুত করিতে ইহা ভ্যাজাল দিয়া সহজে দুগ্ধকে গাঢ় করিয়া থাকে। গরীব লোকে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুদিগকে আহার করায়। ইহার বিশেষ কোন স্বাদ নাই। ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া পাক করিলে ভাতেব মাড়ের ন্যায় দেখায়। ইহা শ্বেত সার খাদ্য, সুতরাং বলকারক পোষক। সহজে পরিপাক হয়। পাকাশায়িক গোলযোগ বিশেষতঃ কলেরা, আমাশয় রোগে ইহা উত্তম পথ্যরূপে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

রসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা বিশুদ্ধ এরোরুটের মধ্যে শরীর পোষনোপযোগী যথেষ্ট পদার্থ বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ইহাতে ছানা জাতীয় উপাদান শতকরা ৮, মাখন জাতীয় উপাদান ৩·৬। চিনি জাতীয় উপাদান ৭৫·৩৬, লবন জাতীয় উৎপাদন ১·৩২ এবং জল ১৫·৪ বর্ত্তমান আছে।

বিশুদ্ধ এরোরুট উত্তম শ্বেতবর্ণ ও মসৃণ। বিশুদ্ধ এরোরুট মধ্যে জলীয় প্রভৃতি অংশ শতকরা ১৮, মাংসপেশী নির্ম্মাপক ৪ সন্তাপক ৭৭ এবং অপরাংশ ১ বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"এরো" নামক বৃক্ষের মূল হইতে এরোরুট পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা আর্দ্রক ও হরিদ্রা জাতীয় বৃক্ষের ন্যায় এবং ইহার শস্য তদনুরূপ মূল হইতে পাওয়া যায়

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দ্বীপ সমূহে বিশেষতঃ বারমুডা দ্বীপে ইহা বহুল পরিমাণে স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ সকল স্থানে ইহার চাষ ও পালো প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুরে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এবং তথায় ইহার পালো প্রস্তুত হইয়া সকলদেশে প্রেরিত হয়। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থনেও এরোরুটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার গাছগুলি দেখিতে বনআদা বৃক্ষের ন্যায়, পাতাগুলি তাহা অপেক্ষা কিছু বড়। সারযুক্ত রসাল মাটিতে জন্মিলে গাছগুলি প্রায় বন আদা গাছের ন্যায় বড় হয়। নতুবা প্রায় আদার গাছের ন্যায় হইয়া থাকে। আদা ও হলুদের ন্যায় ইহা নয় দশ মাসে জন্মিয়া থাকে এবং ইহার মূল বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইলেই বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার মুলগুলি শ্বেতবর্ণ। বৃক্ষেরদিকে যে স্থানে সংলগ্ন থাকে সে দিকে মোটা ক্রমে নিম্নদিকে সরু হইয়াছে। বড় মূলগুলি প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত

লম্বা হইয়া থাকে। প্রায় ২।৩ ইঞ্চি মোটা হয়। ইহার গাত্রগুলি গোল গোল রেখার দ্বারা চিহ্নিত। মূলের উপর একপ্রকার পাতলা ছাল থাকে সেগুলি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া উঠাইয়া ফেলিলে দেখিতে অতি সুন্দর দেখায়। এক একটী বৃক্ষের ছোট বড় প্রায় ৮।১০টী মূল পাওয়া যায়। নিতান্ত ক্ষুদ্রগুলি রোপণ করার জন্য রাখিয়া বৃহৎগুলির পালো বাহির করিতে হয়। এই বৃক্ষের কোন কোনটিতে ছোট ছোট হলুদ আভাযুক্ত ফুল ও পিঁপুলের ন্যায় সরু ও লম্বা একপ্রকার ফল জন্মিয়া থাকে কিন্তু সমস্ত বৃক্ষে এইরূপ ফুল বা ফল হয় না।

বাঙ্গলাদেশে অনেকে উহা সখ করিয়া ২।৪টী বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন। উহা একস্থানে একবার রোপণ করিলে সহজে নষ্ট হয় না ও বার বার বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জমি সরস না থাকিলে মরিয়া যায়। লেখক প্রায় ২০ বৎসর হইল ইহার আবাদ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসরেই ইহার চাষ বেশী করিয়া, ইহা হইতে পালো বাহির করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

রোপণ প্রণালী—

বৈশাখ মাসে আদা ও হলুদের ন্যায় উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল রোপণ করিতে হয়। যে সকল জমি ঠাণ্ডা সেঁতসেঁতে ও সারযুক্ত সেইরূপ জমিতেই উহা ভাল জন্মিয়া থাকে। ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করিলে বৃক্ষগুলি ও মূল বড় ও

পুষ্ট হয় না সুতরাং ফল কম হয়। বহু কালের বন জঙ্গল মারিয়া ইহার চাষ করিলে বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জমি উত্তমরূপে লাঙ্গল দিয়া বা কোদালি করিয়া মাটি ভালরূপে আল্‌গা ও ছাইয়ের সার দেওয়া ভাল। উদ্ভিদ্ সার বা বৃক্ষ পত্রাদি পচিয়া যে সার হয় এরোরুটের পক্ষে সেই সারই উৎকৃষ্ট বৈশাখ মাসে ইহার মূল হলুদের ন্যায় সারি করিয়া রোপণ করতঃ মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক মূলে ৪ চারি আঙ্গুল হইতে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ফাঁকে রোপণ করা কর্ত্তব্য। রোপণের পর গাছগুলি মাটি হইতে বাহির হইয়া গেলে ঘাস পরিষ্কার করতঃ জমি উত্তমরূপে কোদালি করিয়া মাটি আল্‌গা ও গাছের গোড়ায় হলুদ, আদার ন্যায় পিলি করিয়া দিলে এক একটী বৃক্ষে যথেষ্ট জল জন্মিয়া থাকে। নতুবা মাটী শক্ত থাকিলে মূল ছোট হয় অথবা সরু হইয়া অধিক মাটীর নীচে চলিয়া যায় এবং উঠাইবার সময় সহজে উঠান যায়না ও তাহাতে শস্যও কম পাওয়া যায়।

গাছগুলি বড় হইলে পড়িয়া যাইতে পারে। গাছ পড়িয়া গেলে মূল ভাল হইতে পারে না। গাছগুলি খাড়া রাখিবার জন্য গোড়ায় বেশী মাটী দেওয়া কর্ত্তব্য। একই জমিতে, প্রত্যেক বৎসর রোপণ না করিয়া প্রত্যেক বৎসরেই ভিন্ন ভিন্ন জমিতে রোপণ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পৌষ মাসের শেষে বা মাঘ মাসের প্রথমে যখন গাছগুলি

পাকিয়া যায় তখন গাছগুলি কাটিয়া ফেলিয়া মূলগুলি মাটি হইতে কোদালি দ্বারা উঠাইতে হয়। উঠাইতে বেশী বিলম্ব হইলে, অনেক মূল পচিয়া যায়। বড় মূলগুলি কার্য্যের জন্য রাখিয়া ছোটগুলি বীজের জন্য ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে ঢাকা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ইহা একটী লাভজনক কৃষি কার্য্যের অন্তঃর্ভূক্ত, এক বিঘা জমিতে ইহার আবাদ করিতে নিম্ন লিখিত রূপ ব্যয় ও আয় হইতে পারে।

ব্যয় ঃ—

একবিঘা জমির খাজনা—	২৲
লাঙ্গল, জঙ্গল সাফাই ইত্যাদি খরচ—	১০৲
বিছন, রোপণ, সারিবান্ধা ও মাটি আলগা করা ইত্যাদি খরচ—	৪৲
মূলগুলি উঠাইবার খরচ—	২৲
পালো প্রস্তুতের খরচ—	২৲
	মোট ২০৲ টাকা

আয় ঃ—

এক বিঘা জমিতে যে মূল জন্মে তাহা হইতে ৪—৫ মণ পালো জন্মিতে পারে মূল্য কম পক্ষে প্রতি মণ	৮৲
ধরিলেও ৪০৲	
	২০৲ টাকা লাভ

কোন কোন বৎসরে ১৫।১৬ টাকা দরেও এরোরুট বিক্রয় হইয়া থাকে।

ইহার আবাদ করিয়া রুটগুলি আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে আমরা ক্রয় করিয়া লইতে পারি। অথবা কেহ মূল হইতে পালো করিতে ইচ্ছা করিলে আমরা তাহার প্রক্রিয়া শিখাইয়া দিতে পারি এবং পালোগুলিও আমরা ক্রয় করিয়া লইতে পারি।

ইহা বিক্রয় জন্য বেগ পাইতে হয় না। সকল সহরেই উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে এবং ইহাই কৌটায় করিয়া রোগীর উত্তম পথ্যরূপে বিক্রয় হয়। আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহার পালো প্রস্তুত করিয়া থাকি। যিনি এই এরোরুটের চাষ ও ইহা দেশে প্রচার জন্য আমাদের সাহায্য করিবেন তাঁহাকে সাহায্য ও ধন্যবাদ প্রদান করিব।

সংক্ষেপে আয়কর কৃষি।

ধান, পাট ইত্যাদি বিস্তৃত আকারের কৃষি ছাড়াও আমাদের এমন কতকগুলি কৃষি আছে যাহা অল্প মূলধনে, অল্প জমীতে, অল্প শ্রমে সম্পন্ন হইতে পারে অথচ সে সকল ধান, পাটের চাষ হইতে অনেক বেশী লাভজনক; কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেরই তাহা জানা না থাকায় সে সকলের চাষ বা তাহা হইতে অর্থোপার্জ্জন করিতে আমাদের দেশে কাহাকেও বড় দেখা যায় না। এখানে এইরূপ কতকগুলি সংক্ষেপ অথচ আয়কর কৃষির পরিচয় প্রদত্ত হইল।

লতা-কস্তুরী

পনর লক্ষ একর জমিতে পাট বেশী চাষ করায়, আবশ্যক অপেক্ষা পাট বেশী হওয়ায়, চাহিদা বসিয়াছে, ফলে পাটের দাম ৩।৪ টাকা মণ হইয়াছে। জমির খাজনা ও কৃষকের শ্রমের দাম পোষাইতেছে না। কংগ্রেস পাট চাষ বারণ করিতেছে, সরকার এরোপ্লান সাহায্যে পাট চাষ কমাইবার নোটীশ বিতরণ করিতেছেন। কৃষকেরা মনে করিতেছে পাটের পরিবর্ত্তে আমরা ঐ জমিতে কি চাষ করি? আমার মতে ১৫ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু চাষ করিলে ভাল হয়। যাহারা বলেন "আমাদের জমিতে ইক্ষু চাষ হয় না, পাট চাষ করিতে হইবে" তাহাদিগের কিছু জমিতে আমি লতা-কস্তুরী চাষ করিতে বলিতেছি।

লতা-কস্তুরীও পাট জাতীয় গাছ। তবে ইহার বীজগুলি মৃগনাভির তুল্য গন্ধপ্রদ। ইহার ইংরাজী নাম Vegetable Musk. পাট যে প্রণালীতে আবাদ করিতে হয়, ইহার চাষও তদ্রূপ। কিন্তু পাট অপেক্ষা ইহার আঁশ অধিক সাদা চিক্কণ এবং কোমল। ইহার ফল্‌ন চুঁচুড়া গ্রিণ পাটের সমতুল্য অথচ দাম বেশী।

গাছের চেহারা বা পরিচয়—

এই গাছগুলি অনেকাংশে ঢেঁড়শ গাছেরই অনুরূপ।

সাধারণতঃ ৬।৭ হাত উঁচু হয়। ইহার পাতা তিন অংশে বিভক্ত, দেশী ডুমুরের পাতার ন্যায় খস্‌খসে। বীজ বপনের ২॥ মাস পরে ফুল ধরে, ফুলগুলি প্রথমতঃ পিঙ্গল বর্ণ থাকে, পরে রৌদ্রে শুকাইয়া লাল হয়। ফল ঢেঁড়শের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কিন্তু ক্ষুদ্র ফলগুলি বড় বড় কামরাঙ্গার ন্যায় পাঁচ অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশে ৮।১০টী বীজ থাকে, বীজগুলির বর্ণ শ্বেতাভ কাল আকৃতি, আংশিক কুচের ন্যায় কিছু ক্ষুদ্র। হস্তে মর্দ্দন করিলে মৃগনাভি কস্তুরীর গন্ধ পাওয়া যায়।

জমি নির্ব্বাচন—

উঁচু জমি যেখানে জল না উঠে এবং বৃষ্টি হইলে জল জমিয়া না থাকে। দোআঁশ জমি উৎকৃষ্ট চুঁচুড়া গ্রিণ পাট বা আউশ ধান্য যে সকল জমিতে হয়।

সময় নির্ব্বাচন—

বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈশাখের বৃষ্টির পর জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বোনা চলে। একবার বপন করিলে ৩ বৎসর ফল ও পাট পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি /২ সের বীজ লাগে।

জমির পাট—

পাটের জমির মত চাষ করিতে হয়, বিঘাপ্রতি একগাড়ী গোবর সার ও ১/ মণ হাড়ের গুঁড়া দিলে তিন বৎসর চলিবে। আষাঢ় শ্রাবণে গাছ ছাঁটিয়া দিলে কর্ত্তিত স্থান হইতে ৭।৮টী বা ততোধিক ডাল বাহির হইয়া ঝাড় বাঁধিয়া উঠে।

সূত্র বা পাট প্রস্তুত করণ—

গাছগুলি হইতে প্রতি বৎসর আষাঢ় বা শ্রাবণে ডাল ছাঁটিয়া পাটের ন্যায় জলে পচাইতে হয়, এবং পাটের ন্যায় ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়, পাট হইতে ইহার আঁশ দৃঢ়, উজ্জ্বল, মসৃণ। বল্কল নূতন হইলে, সূত্র কোমল ও সূক্ষ্ম হয়। কিন্তু ফল পাকিবার পর গাছ কাটিলে তাহার আঁশ দৃঢ় ও কর্কশ হয়, ইহার দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করা যায়। উৎকৃষ্ট সূত্র পাইতে হইলে প্রতি বৎসরই পাটের ন্যায় চাষ করিতে হয়, বিঘা প্রতি ছয় মণ পাট পাওয়া যায়। দাম সাধারণ পাট অপেক্ষা বেশী।

বীজ—

বিক্রয় করিতে হইলে, বর্ষার পূর্ব্বে বপন করিলে ভাদ্র মাসে ফুল হয়, আশ্বিন কার্ত্তিকে ফল হয়, পৌষ মাসে ফলগুলি শুকাইয়া যায়। এই সময়ে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। প্রতি গাছে প্রায় অৰ্দ্ধ সের বীজ পাওয়া যায়। ইহার বীজ নানাবিধ ঔষধে, সুগন্ধি তৈলে সাবানে এবং তামাকের মসলায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা মণ দরে বীজ বিক্রয় হয়। কখনো ১৷৷০ হইতে ২৲ টাকা সেরও বীজ বিক্রয় হয়। একবিঘা জমিতে ৫/ মণ বীজ হয়।

বীজের গুণ ও ব্যবহার—

(ক) ফরাসী দেশে পমেটম্ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার উপকরণ। (খ) আমাদের দেশে কবিরাজেরা সুগন্ধি

তৈল প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। (গ) ইক্ষুরস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিবার সময় দুর্গন্ধ মিশ্রিত জলের পরিবর্ত্তে লতা কস্তুরীর অপরিপক্ক ফলের রস পুটদিলে গুড় অতিশয় পরিষ্কার হয়। গুড়ের গাদ কাটিবার জন্য হাড়ের কয়লার পরিবর্ত্তে উক্ত রস প্রয়োগ করিলে পরিষ্কার দানাদার চিনি পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার চাষ পাট অপেক্ষা বিশেষ লাভ জনক।

ঢ্যাঁড়শ ভিণ্ডি বা রামঝিঙ্গা।

বপনের সময় ও প্রণালী—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টিতে উচ্চ নির্জ্জলা ডাঙ্গাগুলি হল দ্বারা কর্ষণ করিয়া প্রতি বিঘায় আড়াই সের ঢ্যাঁড়শের বীজ বপন করিতে হয়।

সার—

যে জমিতে ঢ্যাঁড়শের চাষ করিতে হইবে, তাহাও সার দিয়া সতেজ করা প্রয়োজন। সার না দিয়াও ঢ্যাঁড়শের চাষ চলিতে পারে, কিন্তু সার দিলে বহু গুণ অধিক ঈপ্সিত বস্তু পাওয়া যায়: ইহার প্রধান সার—হাড়ের গুঁড়া, প্রতি বিঘায় ২/ দুই মণ করিয়া লাগে।

উপদেশ—

আমাদের বাংলাদেশে মশলাদি সংযোগে ঢ্যাঁড়শের অতি উপাদেয় আহার্য্য প্রস্তুত হয়—সত্য, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। অল্পমূল্যে ঢ্যাঁড়শ বিক্রয় না করিয়া—যাহাতে ঐ ঢ্যাঁড়শের চারা হইতে আরও মূল্য পাইতে পারি—তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তাই আমার উপদেশ—চারাগুলির শিরে শিরে যখন সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিবে, তখনই যদি সেগুলি গাছ হইতে তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ গাছগুলি হইতে সুন্দর সুদৃঢ় উজ্জ্বল পাট প্রস্তুত হয়।

পাট প্রস্তুত করণের প্রণালী—

ভাদ্র আশ্বিন মাসে চ্যাঁড়শ গাছগুলি কাটিয়া গ্রামের বাহিরে অব্যবহৃত পুষ্করিণীতে ১০।১২ দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। ঐ ১০।১২ দিন পরে দেখা যাইবে—আমাদের দেশীয় অতি পরিচিত পাটের মত উহার ত্বক ছাড়িয়া যাইতেছে। ধোপার কাপড় কাচার মত সেগুলি জলে কাচিয়া লইয়া সূত্রগুলি বাহির করিয়া—রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। উহাই চ্যাঁড়শের পাট।

প্রয়োজনীয়তা—

কৃষিজীবির কৃষিই জীবিকা অর্জ্জনের প্রধান উপায়। চ্যাঁড়শের চাষ বেশ লাভজনক কৃষি। ১/ মণ চ্যাঁড়শের পাট বিক্রয় করিলে ৪০৲ চল্লিশ টাকা পাওয়া যায়। যদি এক বিঘা চ্যাঁড়শের চাষ করা যায় তাহা হইলে ১০/ দশ মণ পাট প্রস্তুত হইতে পারে। আর ঐ ১০/ মণ পাট বিক্রয় দ্বারা অন্ততঃ ৪০০৲ টাকা লাভ করিতে পারা যায়।

রহস্যোদঘাটন—

যে কাশী সিল্কের প্রশংসা আমরা মুখে মুখে শুনিয়া থাকি, যাহার জন্য বাজারে বাজারে দর যাচাই করিয়া ঘুরিতে হয়, সেই নয়নমুগ্ধকর কাশী সিল্ক (Benares Silk) এই চ্যাঁড়শের পাট হইতে প্রস্তুত। একটু চেষ্টা করিলে কাশী সিল্ক প্রস্তুত করিয়া আমরা বৎসরে বৎসরে হাজার টাকা পাইতে পারি।

আশ্বাস—

অনেকেই হয়তো ভাবিবেন ১০/ ২০/ মণ পাট প্রস্তুত করিয়া যদি বিক্রয় না হয়, অর্থ উপার্জ্জন না করিতে পারি, তবে এত পরিশ্রম, এত কষ্ট স্বীকার বিফল হইবে। বাস্তবিক—কথাটি খাঁটি সত্য। তবে তাঁহাদের ভীত হইবার কারণ নাই। আমাদের ভারতে—এমন কি বিদেশেও অনেক লোক আছেন—যাঁহারা ঢ্যাঁড়সের পাট ক্রয় করিতে উদ্গ্রীব।

ঝাঁপি প্যাটারী বা ডাঙ্গা-ডেঙ্গো

আমাদের বাংলা দেশে প্যাটারী বা ডাঙ্গা-ডেঙ্গো রাস্তা ঘাটে দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার দ্বারা যে আমরা লাভবান হইতে পারি—তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে না। কখনও হয়তো পূজা-পার্ব্বণের সময় প্যাটারীর আবশ্যক হয়। কিন্তু কে জানিত প্যাটারী আমাদের জীবিকা-উপার্জ্জনের অন্যতম উপায়। এই প্যাটারী হইতেও পাট প্রস্তুত হইতে পারে।

বপন সময় ও বপন প্রণালী—

ঢ্যাঁড়শের যেরূপ জমি তৈয়ার করিতে হয়, ইহার জন্যও সেইরূপ কর্ষিত জমির প্রয়োজন। এক বিঘা জমিতে মাত্র /৫ পাঁচ সের প্যাটারীর বীজ বপন করিতে হয়।

পাট প্রস্তুত করণের প্রণালী—

ঢ্যাঁড়শের পাট প্রস্তুত করিবার যেরূপ প্রণালী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে—প্যাটারীর পাট প্রস্তুত করিতেও ঐ প্রণালীই প্রযোজ্য। ইহাকেও ভাদ্র আশ্বিন মাসে কাটিয়া লইতে হয়।

উপার্জ্জন—

এক বিঘা জমিতে প্যাটারীর আবাদ করিলে ন্যূন্যাপক্ষে ২০০৲ দুই শত টাকা অর্জ্জন করিতে পারা যায়।

আবার পূজার বাজার করিতে গিয়া নব বধূর জন্য রঙ্গীন সাড়ী কিনিবার সময় যে "চাঁদের আলো" সাড়ীই ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয়, যাহাকে দেখিলে নাড়িলে মনে হয়—উহা আলপাকা ভিন্ন আর কিছু নয়, সেই "চাঁদের আলো" সাড়ীই ঐ প্যাটারীর পাট হইতে প্রস্তুত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্যাটারীর চাষে আমরা বহু অর্থের অধিকারী হইতে পারি। ঝাঁপি-প্যাটারীর পাট হইতে ইমিটেসন সিল্ক, বা সিল্ক আলপাকা হয়।

নূতন কথা—

দেশে দিন দিন চাতালের অর্থাৎ চাখোরের দল বাড়িয়া উঠীতেছে, আর চা পান করিতে হইলে চা-চিনির সহিত দুগ্ধ সংযুক্ত থাকা চাইই। আবার বাজারে যাঁহারা বাস করেন—এবং চা না হইলে যাঁহাদের চলেনা, দুগ্ধাভাবে তাঁহাদের বড় কষ্ট পাইতে হয়। তাই দেখা যায়—কোথায় Condensed milk বিক্রয় হইতেছে, আবার কোথায় Milk dust চা-তাল ক্রয় করিতেছেন। সকলে জানা কর্ত্তব্য যে, এই Milk dust প্যাটারীর সাহায্যে প্রস্তুত করিতে হয়।

Milk dust প্রস্তুত করণ—

মাটীর পাত্রে কিংবা 'এলোমিনিয়ম্, কড়াই আগুণের উপর চড়াইয়া তাহাতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে হইবে। এক

দিকে জ্বাল দিতে হইবে, অন্য দিকে প্যাটারীর শিকড় ভাগ দ্বারা ঘুটিলে—ক্রমে ক্রমে ঘন হইতে ঘনতম হইয়া পরিশেষে dust হইয়া যায়, উহাকে Milk dust বলে। Air Tight অর্থাৎ বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে—এইরূপ টীনের মধ্যে রাখিয়া ইহা বাজারে বিক্রয় করা চলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চা-খোরের জীবনের বিশিষ্ট অভাব পূরণ করে।

আকন্দ।

আকন্দ সর্ব্ব-সাধারণের সুপরিচিত। ইহার পাতার উপকারিতা আমরা বুঝি তখন, যখন জল লাগিয়া দাঁতের গোড়া কন্ কন্ করে কিংবা জ্বরে চক্ষু মুখ ফুলিয়া যায়, অথবা কোন উৎকট ব্যাধির সময় ডাক্তার বাবুদের নির্দ্দেশ অনুসারে আকন্দের পাতার সেক দরকার হয়; আর ইহার আটার মর্য্যাদা বুঝি তখন, যখন মাথার কালো কুঞ্চিত কেশগুলির মাঝে মাঝে টাক পরিয়া মরুভূমি হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা যে আরও কত উপকারী, কত লাভজনক তাহা পরে জানা যাইবে।

বপন প্রণালী—

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আকন্দের বীজ ছড়াইয়া কিংবা আকন্দের বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া লইয়া এক হাত অন্তর একটি করিয়া আকন্দের চারা পুঁতিয়া দিতে হয়। এক জমিতে এক বৎসর আকন্দের চাষ করিলে ১০ বৎসর আর ইহার চাষ করিতে হয় না। কাটিলেই ইহা পুনরায় নূতন পত্র লইয়া গজাইয়া উঠে।

আকন্দের আঠা—

আকন্দের আঠায় যে কখনও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, ইহা কেহ ধারণা করিতেই পারে না। অথচ

ইহা অলীক নহে। যে গাটাপার্চ্চার বোতাম, ফাউণ্টেন্ পেনের (Fountain Pen) খোল ইত্যাদি অনেক ব্যবহার্য্য বিলাসসামগ্রী বিক্রীত হইতে সেই গাট্টাপার্চ্চাই (Dichopsis Gall) আকন্দের আঠা হইতে প্রস্তুত।

পাট্টাপার্চ্চা প্রস্তুত করণ—

এক সের আকন্দের আঠা সংগ্রহ করিয়া দুই সের ফুটন্ত জলে ফেলিয়া দিতে হয়। সেই দুই সের জল অগ্নি ও তাপ সাহায্যে বাষ্পাকারে নিঃশেষ হইলে দেখা যাইবে, পাত্রটাতে রবারের মত কি একটী বস্তু পড়িয়া আছে। উহা গাট্টাপার্চ্চা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা বিক্রয় দ্বারা অনেক লোক জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

আকন্দের পাট—

ঢ্যাঁড়স ও প্যাটারীর মত এই আকন্দ হইতেও পাট প্রস্তুত করিতে পারা যায়। তবে প্রভেদ এই যে, উক্ত দ্বিবিধ পাটকে রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়, কিন্তু ইহাকে রৌদ্রে শুষ্ক না করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। শুষ্ক করিবার কালে যদি পাটগুলির নীচে গন্ধকের ধূম দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা বেশ উজ্জ্বল ও চকচকে হইবে। আকন্দের পাট—অত্যন্ত ভারসহিষ্ণু। শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয় যে, ১ ইঞ্চি পরিমিত সূক্ষ্ম আকন্দের পাটে ৬০৲ মণ ভার অবাধে তুলিতে পারা যায়।

লাভ—

আকন্দের পাট হইতে বিবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া বিদেশে রপ্তানী করিয়া যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে, তাহারা শুধুই সন্ধান করিয়া বেড়ায়—কোথায় আকন্দের পাট পাওয়া যায় ও কাহারা আকন্দের চাষ করে। ১/ মণ আকন্দের পাটের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

শ্বেত আকন্দের মূল—

মদনানন্দ মোদকের প্রধান উপাদান। চারি পাঁচ বৎসর পর শ্বেত আকন্দের গাছগুলি কাটিয়া ফেলিয়া যে মূল পাওয়া যায় তাহার মূল্য আছে। একটী শ্বেতআকন্দের মূল বিক্রয় করিয়া ৵০ আনা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

কলাগাছ।

কলাগাছ জন্মাইবার প্রণালী—

আট হাত অন্তর ২ হাত গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তগুলি সোরা, ধানের আগড়া পুড়াইয়া তাহার ভষ্ম ও পঙ্ক-মাটীতে তাহা ভর্ত্তি করিয়া এক এক বৎসর কাল জলে পচিতে দিতে হইবে। ইহাতেও একটী উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমরা জানি—কলাগাছ বেশী লম্বা হইলেও বিপদের সম্ভাবনা। ঝড় তাহাদের প্রধান শত্রু। তাই যদি কলার চারাগুলি সেই দুই হাত পরিমিত গর্ত্তের মধ্যে পুতিয়া দেওয়া যায়—গাছগুলি বড় হইতে তিন হাত সাড়ে তিন হাতের বেশী হইবে না, সুতরাং ঝড়ে পড়িবার সম্ভাবনাও রহিবে না, অথচ গাছগুলি সতেজ সুন্দর হইয়া জন্মিবে।

কলার পাতা

খনা তাঁহার বচনে বলিয়াছেন,—

"যদি না কাটিস্ কলার পাত
তা'তেই কাপড় তা'তেই ভাত!"

ইহা কতদূর সত্য—আপনারা আমার কলার চাষ পাঠেই জানিতে পারিবেন।

কাশীপুর বরাহনগরে একপ্রকার যন্ত্র বিক্রয় হইতেছে—তাহার মূল্য মাত্র ২৫৲ পঁচিশ টাকা। সেই যন্ত্রের সাহায্যে কলার পাতা হইতে সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সূত্র প্রস্তুত করণ।

কলার পেটো অংশটী বাদ দিয়া কলার পাতাটী কাটিয়া তাহা থেতো করিয়া ২।৪ দিন গোবর জলে ফেলিয়া রাখিতে হয়। দুই চারিদিন পরে যখন সেগুলি পচিয়া যায়, তাহা হইতে পাটের মত সূত্র বহির্গত হয়। আকন্দের পাটের মত পরে উহাকে ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। চরকা বা টেকোর সাহায্যে ঐ কলার পাট হইতে সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতে পারা যায়। সেই সূত্র হইতে বস্ত্র বয়ন করিয়া লইলে মাঞ্চেষ্টারের মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। প্রাচীন যুগের ইতিহাসে যে কাষায়-বসন-পরিহিত ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিবরণ শ্রবণ করি, সেই কাষায় বসন বা ক্ষৌম বাস এই কলার সূত্র হইতে নির্ম্মিত। ঐ বসন শুদ্ধ ও পবিত্র।

ফল—

কাঁচা কলা, পাকা কলা বাজারে বিক্রয় করিলেও বাজার দর অনুসারে আশানুরূপ মূল্য পাওয়া যায়। এক বিঘার কলা-বাগান থাকিলে প্রায় ৩০০ কাঁদি কলা পাওয়া যায়, আর ৩০০ কাঁদি কলা বিক্রয় করিলে যে কত লাভবান হওয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করিলেও পুলকে মন নৃত্য করিয়া উঠিবে।

বেনানাফুড (Benana Food)—

কলা হইতে এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়

তাহাই কলার আটা বা Banana Food বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়।

বেনানা ফুড বা কলার আটা প্রস্তুত করণের প্রণালী—

কলাগুলি পক্ক হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কাঁদি হইতে ফলগুলি ছাড়াইয়া তাহাদের খোসাগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। পরে ছুরি বা অন্য কোনও অস্ত্র দ্বারা "চাকা চাকা" করিয়া কাটিয়া দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, শুষ্ক হইয়া গেলে ঢেঁকিতে কুটিয়া বা জাঁতায় পিষিয়া যে আটা প্রস্তুত হয়, তাহাই কলার আটা বা Banana Food। ইহা বিক্রয় করিলে কলা বিক্রয় অপেক্ষা অধিক মূল্য পাওয়া যায়।

কলার মধু—

অতি উপাদেয় এবং উপকারী খাদ্য। কলার মধু প্রস্তুত করণের প্রণালী—

পক্ক কলাগুলি খোসা ছাড়াইয়া একসঙ্গে মাখিয়া লইতে হয়। /১ এক সের পরিমিত কলায় অর্দ্ধ ছটাক সিলেট চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে ময়রাদের রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার জন্য ছানার জল নিংড়াইবার যে প্রণালী—অর্থাৎ একটী গামছা বা কাপড়ে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া উচ্চ স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে, একটু একটু করিয়া রসগোল্লার রসের মত রস পড়িতেছে। বাস্তবিক উহা রসগোল্লা রসের মত মিষ্ট—অথচ তাহা অপেক্ষা

বেশী মূল্যবান্। বিক্রয় করিলে যে মূল্য পাওয়া যায়, তাহার অষ্টগুণ মূল্য এই কলার মধু বিক্রয়ে পাওয়া যাইবে।

কলার পেটো পুড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এখন আমরা সোডা, সাবান দিয়া কাপড়াদি পরিষ্কার করিয়া থাকি। কিন্তু পূর্ব্বে কলার ক্ষার দিয়া ঐ সব কার্য্য সাধিত হইত।

আনারস।

সংক্ষিপ্ত দ্রব্যগুণ—

আনারস-সারস, রেচক এবং শ্লেষ্মা ও কৃমিনাশক। ইহার কচি পত্রের রস মুখ-ব্রণ নাশক।

ইতিবৃত্ত—

আনারস দক্ষিণ আমেরিকার ফল, ইহা পুর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে আনীত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম নিবাসীগণ আনারসকে "আনানস" বলে; আমরা আনারস নাম দিয়াছি। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে মাদ্রাজে আনারসের চাষ আরম্ভ হয়। তথা হইতে চট্টগ্রাম, সিলেট ও আসাম প্রদেশে চাষ হয়। সিঙ্গাপুরের কুইন্ নামক আনারস বঙ্গদেশে ভাল জন্মে।

জমি-নির্ব্বাচন—

উঁচু দোঁয়াস জমি যথায় জল না উঠে ও জল না দাঁড়ায়। অনেক আম, কাঁঠাল, শুপারী, নারিকেল বাগানের ছায়ায় আনারস রোপণ করিয়া থাকেন। ঐরূপ ছায়াযুক্ত স্থানের আনারস উৎকৃষ্ট নহে, অধিকন্তু ছোট হয়, মুখ কুট কুট করে ও মিষ্টতা কম থাকে। মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যের কিরণের আনারস উৎকৃষ্ট হয়।

রোপন প্রণালী ও সময়—

চৈত্র ও বৈশাখে জমি উত্তম রূপে চাষ দিয়া প্রত্যেক ২হাত অন্তর একটি করিয়া গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তের ভিতর হাড়ের গুড়া ও চূণ এবং সোরা ও পচা পাঁকামাটি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গর্ত্তটি প্রায় বুজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে আষাঢ় মাসে ঐ গর্ত্তে একটী করিয়া চারা একটু বাঁকা করিয়া পুতিবে, এক বিঘা জমিতে ১৬০০ শত চারা রোপণ করিবে। চারাগুলি বেশ লাগিয়া গেলে প্রতি দুই মাস অন্তর গোড়া পরিষ্কার করতঃ মাটি দিবে। আনারসের গোড়ার চারা রোপণ করা উচিত ; মাথার চারা ভাল হয় না।

সার—

চূণ দিলে মিষ্ট হয়, হাড়ের গুড়া দিলে আনারস বড় হয়, বোঁদামটি দিলে পাতা বড় হয়। আমি এই কারণে মিশ্র সার ব্যবহারের পক্ষপাতী। চতুর্থ বৎসরে ক্ষেতে বিঘা প্রতি ৩০ মণ গোবর দিতে হইবে।

বুনো অনারসকে মিষ্ট করা—

ভারতে আনারস অনেক স্থানে জন্মে। কিন্তু অনেক আনারসই বুনো, খাইলে মুখ কুট কুট করে এবং খাইতে সুমিষ্টও নহে। ভাল আনারসের চাষ করিবার চেষ্টা এদেশে নাই। এই বুনোজাতীয় আনারসগুলির চারা, উচু জমিতে, যেখানে জল না উঠে ও জল না দাঁড়ায় এবং কোনরূপ ছায়া না থাকে, মুক্ত বায়ু

ও রৌদ্রযুক্ত স্থানে উত্তমরূপ চাষ করিয়া ২ হাত অন্তর এক একটী এক বিঘত গভীর গর্ত্ত করিয়া প্রতি গর্ত্তে এক মুঠা হাড়ের গুড়া, একমুঠা চূণ, একমুঠা সোরা, বোঁদামাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়া চারা বসাইলে এই গাছের ফল ওজনে ভারী এবং মিষ্ট আস্বাদ বিশিষ্ট হইবে। আমেরিকাতে বুনো আনারস মোথা ফেলিয়া টুকরা করিয়া কাটিয়া, সেইগুলি কিয়ৎ পরিমাণে শুকাইয়া লইতে হয়, পরে চিনি মাখাইয়া আবার শুকাইয়া লইতে হয়, ইহাতে প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ চিনি আনারসগুলির গায় লাগিয়া যায়। আনারসের টুকরা-গুলি অল্প অল্প সরস থাকিবে অথচ এমন শুক্না হইবে যে টুকরাগুলি কেহ কাহারো গায়ে না লাগে। এরূপ প্রস্তুত টুকরাগুলি বায়ুশূন্য কাঁচের বা টিনের জারে বন্ধ করিয়া রাখিলে সহজে খারাপ হয় না। এইরূপ আনারসই স্বাদ ও গন্ধে ভাল টাট্কা আনারসেরই মত। ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও অধিকতর মুখ রোচক। আমেরিকানগণ আনারস খোলা বাতাসে ও রৌদ্রে শুকান ভাল বিবেচনা করেন না। তাহারা ষ্টীম সাহায্যে শুকাইয়া লয়। যখন টুকরাগুলি শতকরা অবস্থানুযায়ী ৬৫ হইতে ৭৫ ভাগ শুকাইয়া ওজন কম হইল, তখন ঠিক তৈয়ারী হইল বলিয়া মনে করে, তৎপর তাহাতে চিনি মাখায়। চিনি মাখিবার কালে যে তরল রস বাহির হয় তাহা অতি উপাদেয়, ঐ রস বাজারে বিক্রয় হয়, অনেকে আনারসের রসই ব্যবহারে ইচ্ছুক।

আনারস রক্ষার উপায়—

আনারস শীঘ্র পচিয়া যায় না। এজন্য দূর পশ্চিম দেশে এমন কি বিলাত পর্য্যন্ত ইহার রপ্তানী করিতে পারা যায়। ফিলিপাইন্, জামেকা, কিউবা, হিব্রাইডিস প্রভৃতি সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আনারস প্রকৃষ্ট উপায়ে রক্ষিত হইয়া বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে। শতভাগ শীতল জলে তিনভাগ কমার্সিয়াল ফরম্যালীন্ (Commercral Formalion) মিশ্রিত করতঃ তন্মধ্যে কোন পরিপক্ক ফল ১০ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ফল এক হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আম্র, কদলী লেবু, আনারস প্রভৃতি ফল এই উপায়ে বহু দূরে প্রেরিত হইতে পারে।

সূত্র—

উদ্ভিদজাত সূত্রের মধ্যে আনারসের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দৃঢ়তম সূত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহা বেন্সেনের ন্যায় কোমল শুভ্র ও সুচিক্কণ এবং ক্ষৌম সূতার (Flax) উৎকৃষ্ট অনুকল্প। ফিলিপাইন দ্বীপের প্রসিদ্ধ আনারসী বস্ত্র (Pineaplce Cloth) ও পিনা নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র, ইহার রেশমবৎ সূক্ষ্ম তন্তু হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত টোয়াইন ডোর, ফিতা ও নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র শিল্পের জন্যও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। জাপান্ জার্ম্মানীতে ইহার পত্র

হইতে পার্চ্চমেণ্টের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। আনারসের সূতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জল সহনশীল অর্থাৎ সহজে জলে পচিয়া নষ্ট হয় না।

কাঁচা পত্রের উপরকার মাংসল অংশ ভোতা অস্ত্র দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিলে সূত্র বাহির হয়, অথবা আখভাঙ্গা কলের সাহায্যে পিষিয়া বা পাতাগুলি থেতো করিয়া গোবর জলে ৪।৫ দিন পচাইয়া রাখিলে সুন্দর সূত্র বাহির হয়। কিন্তু সূতাগুলি ছায়ায় শুকনা করা উচিত ও রাত্রে শিশিরে রাখিলে খুব মজবুত হয়। এই সূত্রের ব্যবহার করিলে আমরা আনারস চাষে প্রচুর লাভ করিতে পারি।

আনারসের মোরব্বা—

আনারসের চাকতি করিয়া ভিনিগারএ (Vinegar) ভিজাইয়া রাখিলে সুমিষ্ট মোরব্বা প্রস্তুত হয়। মোরব্বা বিক্রয় করিয়াও এক বিঘার প্রায় তিন শত টাকা লাভ হইতে পারে।

আনারসের রস—

আনারসের রসে Spirit of Alcohol দিয়া রাখিলে উহা বিক্রয় দ্বারা ৪০০৲ চারি শত টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে।

পাইন্ এপেল (Pine Apple Syrup) রসায়নের সাহায্যে ঐ এক বিঘার আনারস হইতে পাইন এপেল সিরাপ প্রস্তুত করিলে ১০০০৲ এক হাজার টাকা করতল গত হইতে পারে।

কোঙ্গা (Aloe)

আনার, ডাকাতে, করতে মুর্ব্বা ইত্যাদি নাম।

সূত্র প্রস্তুত প্রণালী—

হস্তে তৈল লইয়া আনা-রসের সূত্র নির্ম্মাণ প্রণালী সাহায্যে কোঙ্গার সূত্র প্রস্তুত করিতে হয়। কোঙ্গার-সূত্র-প্রস্তুত আসনের মূল্য ২৲ দুই টাকা হইতে ২।০ দুই টাকা চারি আনা পর্য্যন্ত।

সতর্কতা—

হস্তে তৈল না লাগাইয়া কোঙ্গার সূত্র প্রস্তুত করিতে যাইলে হস্তে ক্ষত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাই পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিলাম।

এরণ্ড ভেরণ্ড বা রেড়ী

বপন সময়—

বর্ষার পূর্ব্বে কিংবা বর্ষার পরে। উচ্চ ডাঙ্গা জমিতে চাষ দিয়া প্রতি বিঘার /৫ সের বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। কিছুদিন পরে সেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়, এবং সেই অঙ্কুর হইতে এরণ্ড বৃক্ষ জন্মে।

নন্দন কাননের যেমন কল্পতরু, স্বর্গের যেমন কামধেনু যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়, সেইরূপ এরণ্ড বৃক্ষ হইতে কত মূল্যবান্ বস্তু পাইতে পারি তাহা এই সামান্য প্রবন্ধে বর্ণনা করা অসম্ভব।

রেড়ীর বীজ—

শুদ্ধ রেড়ীর বীজ বিক্রয় করিলেই এক বিঘার চাষে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা অর্জ্জিত হয়।

রেড়ীর তৈল—

পূর্ব্বে যে রেড়ীর তৈল আমাদের গৃহে গৃহে সাঝেঁর প্রদীপ জ্বালাইয়া দিত, সেই রেড়ীর তৈলই এই এরণ্ড বীজ হইতে প্রস্তুত হয়।

এরণ্ডের ফলগুলি যখন পাকিতে দেখা যাইবে, তখন তাহা তুলিয়া আনিয়া একটী পাত্রের মধ্যে মুখটী আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে ; ২।১ দিন মধ্যে যখন সমস্ত বীজগুলি ফাটিয়া পড়িবে, তখন তাহাদিগকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়।

সেই শুষ্ক বীজগুলির উপরস্থ খোসাটী ছাড়িয়া গেলে দেখা যাইবে, যে উহার মধ্য হইতে দুইটী দল বহির্গত হইয়াছে তখন উহাদিগকে ঢেঁকিতে কুটিয়া লইতে হয়। তৎপরে ফুটন্ত জলে ফেলিয়া দিয়া জ্বাল দিতে Boiling Point বা সিদ্ধ চাউলের মত ফুটন্ত অবস্থায় উপস্থিত হইলে নামাইয়া নাড়া দিতে হয়। নাড়া দিতে দিতে দেখা যায়, উপরে তৈলাংশ ভাসিতেছে, সেই তৈলাংশটুকু ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই-রূপে জল দিয়া, জ্বাল দিয়া নামাইয়া নাড়া দিয়া তৈল বাহির করিতে করিতে যখন দেখা যাইবে আর তৈলাংশ বহির্গত হইতেছে না তখনই তাহা হইতে বিরত হইবে। ঐ যে তৈলটুকু বাহির হইল উহারই নাম রেড়ীর তৈল। আর যে অংশটি পড়িয়া রহিল উহা রেড়ীর খৈল।

কেশ বর্দ্ধক তৈল (Hair Oil)—

গৃহের কর্ত্তাকে নানা ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয়। কোন মেয়ের কেশ উঠিয়া যাইতেছে, কেশ বাড়িতেছে না তখনই তাঁহাকে বাজারে ছুটিতে হয় Bathgate কোম্পানীর কেশ তৈল (Hair Oil) ক্রয় করিবার জন্য। কিন্তু আমরা অজ্ঞ মূর্খ, তাই বুঝি না এই হেয়ার অয়েল (Hair Oil) এর স্থান কোথায়! বাস্তবিক আমরা নিজের দেশের জিনিষকে কর্য্যে লাগাইতে জানি না বা পারি না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? এই যে কেশ-তৈল, উহা ঐ রেড়ীর তৈল হইতে প্রস্তুত হয়।

কাঁচা দুগ্ধ ও বাই কার্ব্ব-নেড অফ্ সোডা দ্বারা রেড়ীর তৈলকে (Refine) বা পরিষ্কার করিয়া দিলে রেড়ীর তৈলকে কেশ-তৈল বা Hair Oil এ পরিণত করা যায়। তাহা হইলে আমার বিশ্বাস কেশ-তৈল বিক্রয় করিলেও অর্থ উপার্জ্জন হইবে ; অথচ গৃহপ্রস্তুত তৈল মাথায় মাখিলে দ্বিগুণ কেশ বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে, গৃহের কর্ত্তাকে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না।

একটু রসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা চেষ্টা করিলে, আমরা রেড়ীর তৈল হইতে ক্যাষ্টার অয়েল (Castor Oil) পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে পারি। এক বিঘায় যে রেড়ী বীজ হয় তাহাতে রেড়ীর তৈল তৈয়ারী করিয়া (Castor Oil) ক্যাষ্টার অয়েল প্রস্তুত করিলে অন্ততঃ ৩০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়।

এণ্ডিসূত্র—

আসামে এক প্রকার পোকা পাওয়া যায়, সেগুলি ভেরেণ্ডার পাতায় ধরাইয়া দিলে তাহারা ঐ পাতায় গুটী প্রস্তুত করিতে থাকে সেই গুটী হইতেই এণ্ডিসূত্র বহির্গত হয়। গুটী বিক্রয় করিলেও অর্থ-সমাগমের সম্ভাবনা, সূত্র বিক্রয় করিলে ত কথাই নাই। আবার যদি সেই সূত্র হইতে বস্ত্রাদি বয়ন করা যায়, তাহা হইলে অনেক অর্থ আমাদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। ইহার সূতা তৈয়ার জন্য শিল্পিবিভাগ রিলিং মেশিন প্রস্তুত করিয়াছেন।

রেড়ীর খইল—

পূর্ব্বেই রেড়ীর খইল কিরূপে হয় জানাইয়াছি। এখন উহার উপকারিতা সকলের জানা কর্ত্তব্য। অপরাপর খইলের মত রেড়ীর খইলও সারের কার্য্য করে, তবে সর্ব্বাপেক্ষা ইহা বেশী কার্য্যকারী! যে স্থানে বিঘায় ৫০/ মণ আলু হয় সে স্থানে যদি রেড়ীর খইল দেওয়া যায় যাহা ন্যূনপক্ষে ১০০/ মণ আলু উৎপন্ন হইবে। ইক্ষুক্ষেত্রের ইহা প্রধান সার। রেড়ীর খইল দিয়া জমি চাষ করিয়া বেল্‌জিয়াম আজ সমৃদ্ধশালী, অথচ যে দেশে প্রচুর এরণ্ড উৎপন্ন হয় সে দেশে লোকেরা রেড়ীর খইল ব্যবহারের প্রণালী অবগত না থাকায় আলুর চাষে লাভবান হয় না, ইক্ষুর চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মসল্লা—

বাংলার পলি পড়া মাটিতে জল শুকাইয়া গেলে কার্ত্তিক মাসে ঘন ঘন চাষ দিয়া বিঘা প্রতি ১/ মণ রেড়ীর খৈল সার দিয়া জিরা, মৌরী, যোয়ান, ইসব্‌গুল, তোকমারী ও মেথী, বপন করিলে বেশ উত্তমরূপ জন্মে। ১৩৪০ সনের মাদারীপুর প্রদর্শনীতে জিকির আলির উৎপন্ন জিরা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি স্বচক্ষে তাহার জমীতে ভাল জিরা দেখিয়াছি ; সে প্রথমে পুরস্কার পাইয়াছে।

সুরুটে।

ইহা এক জাতীয় সরিষা। আমরা তাহার বীজ সরিষার মত দেখিয়াছি কিন্তু ভাবি নাই যে, উহা হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। উহার তৈল ব্যবহারোপযোগী না হইলেও কৃষ্ণ বা শ্বেত সরিষার সঙ্গে ভেজাল চলে। কৃষ্ণ বা শ্বেত সরিষার সঙ্গে মিশ্রিত করিলে তৈলের খুব ঝাঁজ হয়। ঐ যে বাজারে দেখা যায়, তৈলটী তেমন পরিষ্কার নয়, অথচ বেশ তীব্র ঝাঁজ আছে উহার কারণ যে উহাতে সুরুটের তৈল মিশ্রিত হইয়াছে।

সুরুটের খইলেও উর্ব্বরতা সম্পাদন করে।

সজ্‌না।

লাগাইবার সময় ও প্রণালী বর্ষার পূর্ব্বে সজ্‌নার ডালগুলি পুঁতিয়া দিলে, উহা হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা বহির্গত হয়; এবং ২।১ বৎসরের মধ্যেই বেশ বড় সজ্‌নার বৃক্ষে পরিণত হইয়া যায়।

উপকারিতা—

সজ্‌নার ফুল, সজ্‌নার পাতা সজ্‌নার খাড়া সবই আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে। তাই দেখা যায় বাজারের সময়ে লোকে সখ করিয়া ক্রয় করিতেছে, ফুল পাতা ও খাড়া

উহা একটী অর্থাগমের সুগম পন্থা। তদ্ব্যতীত যদি সজ্‌নার খাড়াগুলি পাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পক্ক সজ্‌না খাড়াগুলির বীজ হইতে মূল্যবান Sweet oil অর্থাৎ ঘড়ি মেরামত করিবার জন্য যে তৈল ব্যবহার হয়—সেই তৈলপ্রস্তুত হয়।

পক্ক খাড়াগুলির মধ্য হইতে বীজগুলি বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। পরে কলুর ঘানিতে পিষিলে সরিষার তৈলের মত বাহির হয়। ঐ তৈলই Sweet oil, আর উহার খইলও সাররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মানকচু।

জন্মাইবার প্রণালী—৯ নয় ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসের গর্ত্ত করিয়া প্রতি দুই হাত অন্তর মানকচু মাথার পাতাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া লাগাইতে হয়। গর্ত্তগুলির মধ্যে ছাই ও রেড়ীর খইল সমান ভাগে সার দিতে হয়, আর মাঝে ছাই দিতে হয়। ছাই ইহার একমাত্র সার। মানকচু নীরস রৌদ্রযুক্ত জমিতেই ভাল ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ১ বিঘায় মানকচু চাষ করিলে ৪০০৲ চারিশত টাকা লাভের সম্ভাবনা। ২ হাত অন্তর কচু লাগাইলে ৪০টী করিয়া গাছ প্রতি লাইনে হইবে ও ৪০ লাইনে ৪০ X ৪০ = ১৬০০ শত মানকচু পাওয়া যাইবে।

———

ওল।

জন্মাইবার প্রণালী—শুষ্ক ভূমিই ইহার উপযুক্ত। ক্ষেত্র—১ বিঘত গভীর ২ হাত অন্তর গর্ত্তে পচা খড় বা পচা পাতাও তৎসঙ্গে রেড়ীর খইল দিয়া ওলের মুখী (বীজ) গুলি বসাইয়া মাটী দিয়া ভরাট করিতে হয়। ১ বৎসর পরে দেখা যাইবে—উহারা /২ সের /২৷৷০ সের পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারও প্রত্যেকটীর মূল্য দুই আনার কম নহে।

সোলা।

বপন প্রণালী—গ্রীষ্মকাল বা তৎপূর্ব্বে পুষ্করিণীর যে অংশ শুষ্ক হইয়া যায়—সে অংশে সোলার বীজ ছড়াইয়া দিলে—সোলার উৎপত্তি হয়।

প্রয়োজনীয়তা—সোলার কর্ক (ছিপি) নৈমিত্তিক ব্যবহার্য্যের মধ্যে। আবার সেই সোলার হ্যাট (টুপি) প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে সোলার দাবীও আছে, সোলাতেও অর্থের আশা করা যায়।

পানিকচু বা সোলাকচু।

জন্মাইবার প্রণালী—পুষ্করিণীর জল শুষ্ক হইবার কালীন ঘোলা করিয়া দিয়া জল কর্দ্দমাক্ত করিয়া দিতে হয়। সেই কর্দ্দমাক্ত জলের মধ্যে পানিকচুর চারাগুলি বসাইয়া দিতে হয়। জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কচুর পাতাও উপরে উঠিতে থাকিবে। যদি কোনক্রমে জল পাতার উপরেই উঠিয়া যায়, শীঘ্র পাতাগুলি বাড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাহাদিগকে মাটি হইতে তুলিয়া দিতে হইবে। শ্রীভগবানের এমনি সৃষ্টি-কৌশল যে, তাহাতে উহার বৃদ্ধির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না। পানিকচু জলের মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া বর্দ্ধিত হইবে।

আশা—উহা বিক্রয় করিলেও অর্থ-চিন্তা হইতে কতকটা অব্যাহতি পাওয়া যায়।

বাবলা।

ইহা একটী অনায়াস-লভ্য কৃষি। আমাদের দেশে যথায়-তথায় ইহা জন্মাইতে দেখা যায়। ইহাও আমাদের বিশেষ উপকারী।

বাব্‌লার কাঁচা ফল—ইহা দুগ্ধবতী গাভীর উপাদেয় খাদ্য। যে সব গাভীর দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাদিগকে বাবলার কাঁচা ফল খাওয়াইলে যথেষ্ট দুগ্ধ দান করিবে।

বাব্‌লার পাকা ফল—হরিতকী, আমলকী ও বহেড়ার সহিত বাব্‌লার ফল এক সপ্তাহকাল তাম্রপাত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ১ সপ্তাহ পরে অগ্নি সংযোগে ফুটাইয়া হীরাকস মিশাইলেই সুন্দর কালী প্রস্তুত হয়। নিজেদের লিখিবার কালী ত ক্রয় করিতে হইল না, উপরন্তু বাজারে বিক্রয় করিলে অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে।

বাব্‌লার আঠা—বাব্‌লার আঠা হইতে গঁদ প্রস্তুত হয়। বাব্‌লার চাষ করিয়া প্রতি বৎসর বাব্‌লার আঠাও বিক্রয় করা যাইতে পারে।

বাব্‌লার ছাল—চামড়া কষ (Tan) করিতে হইলে বাব্‌লার ছাল বিশেষ দরকারী। বৃক্ষগুলি না মারিয়া প্রতি বৎসর বাব্‌লার ছাল রপ্তানী করিয়া প্রভূত অর্থ লাভ করা যায়। ইহার মণ ৫৲। ৭৲ টাকার কম নহে।

কুল গাছ।

লা’ হইতে লাক্ষার সৃষ্টি। এই লাক্ষা আমাদের দেশে এখন খুব প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। লাক্ষার দরও খুব বেশী। আমি স্বয়ং অনেক লোককে গালা বিক্রয় করিয়া বড় লোক হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু সেই লাক্ষাই আজ লা’ হইতে প্রস্তুত, আবার এই লা’ কুল প্রভৃতির বৃক্ষেই জন্মগ্রহণ করে।

লা' জন্মাইবার প্রণালী—কুল—পাকিলে গাছের পুরাতন শাখা-প্রশাখাগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। নূতন পত্র বাহির হইলে শাখায়-শাখায় লাক্ষার বীজ ধরাইয়া দিতে হয়। ২।১ বৎসরের মধ্যে সুন্দর লাক্ষা প্রস্তুত হইয়া যায়।

পার্থক্য—কুসুম গাছের লাক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুলের লাক্ষা তাহারও নিম্নে। কিন্তু ইহারা একই প্রকার কৃষি। অনায়াসলভ্য——অথচ বহু লাভজনক।

ঘৃতকুমারী।

পুনর্ণবা (পুরুতে) বাকস অনন্তমূল, শতমূল ইহারাও আমাদের দেশের অনায়াসলভ্য কৃষি। ইহারা কবিরাজদের বিশেষ দরকারী, এবং এই ব্যাধি প্রপীড়িত দেশবাসীরও মহান্ উপকার সাধন করে।

ঘৃতকুমারীর ১/০ এক মণের দাম দশ টাকা।

পান ও পানজাতীয় লতা।

যে সব জমিতে জল দাঁড়ায় না সেই সব উন্নত জমিতে দো-আঁশলা বা এঁটেল মাটীতে বিঘা প্রতি ২০/০ বিশ মণ খইল ও ৫/০ মণ বিরি কলাই সিদ্ধ করিয়া মিশাইতে হয়।

ইহার চারিদিক ঘিরিয়া দিতে হয়, যাহাতে কোনরূপ রৌদ্রের কিরণ সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে। ইহা পরিশ্রম সাপেক্ষ হইলেও লাভজনক। (মৎপ্রণীত বেনেতিবাগ দ্রষ্টব্য)। পান চাষের বাৎসরিক আয় ৫০০৲ হইতে ৭০০৲ টাকা।

পিপুল।

জন্মাইবার প্রণালী—পানের ক্ষেতের মত পিপুলের ক্ষেতও প্রস্তুত করিতে হয়। বৈশাখ মাসে ৪ হাত অন্তর ধঞ্চে ও জয়ন্তি ফুলের গাছ লাগাইয়া পিপুলের চাষ করিতে হয়। এক বৎসর একবার পিপুলের ‘বরোজ’ করিলে ১০ বৎসর লতা না বদ্‌লাইয়া পিপুলের চাষ চলিতে পারে।

এক বৎসরে চাষের আয় ১০০০৲ এক হাজার টাকা (মৎপ্রণীত বেনেতিবাগ দ্রষ্টব্য)।

পানিফল।

সলিলে ইহার জন্ম। পানিফল বাজারে বিক্রয় হয়, আবার পানিফল হইতে আটা প্রস্তুত হয়।

আটা প্রস্তুত করণের প্রণালী——পানিফল সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া যাঁতায় পিষিলে আটা পাওয়া যায়।

বাঁশ।

গৃহস্থের বাঁশে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়, পালি, দোয়াশ ও দুধে এঁটেল মাটিতে বাঁশ উত্তম জন্মে। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ১৪।১৫ হাত অন্তর বাঁশ লাগাইতে হয়। প্রতি বৎসর ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাঁশঝাড়ের গোড়ায় আগুন লাগাইয়া শুকনা পাতা ইত্যাদি পোড়াইয়া দেওয়া ও পাঁক মাটি দেওয়া আবশ্যক।

কয়েকটী অনায়াস লভ্য আয়কর গাছপালা।

বাংলায় প্রায় প্রতি পল্লীতে, রাস্তার ধারে, গৃহস্থের বাড়ীর আশে পাশে, বনে জঙ্গলে এমন কতকগুলি গাছ পালা আপনা হইতেই জন্মে যাহার সদ্ব্যবহার করিলে অর্থাৎ সময় মত সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে আমরা বেশ লাভবান হইতে পারি। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, বটকৃষ্ট পাল কোং, ডাক্তার বসুর ল্যাবরেটরী প্রভৃতি আরও দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা সমুহ, তরল সার, নির্য্যাস ও বটিকা ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য এ সকল বৃক্ষের লতা গুল্ম, ত্বক পত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে লইয়া থাকেন। সুতরাং উহা সংগ্রহ করিয়া উপরোক্ত ব্যবসায়ীদিগকে নিয়মিত

ভাবে সরবরাহ করিতে পারিলে প্রায় বিনা মূলধনেই অর্থো-পার্জ্জন করা যায়। নিম্নে ঐরূপ কতকগুলি প্রয়োজনীয় গাছ পালার তালিকা দেওয়া হইল।

১। ঘৃতকুমারী (ইহা কবিরাজেরা লইয়া থাকেন)।

২। শতমূলী।

৩। শ্বেত আকন্দমূল

৪। ভূমিকুষ্মাণ্ড।

৫। অর্জ্জুনছাল (হৃদরোগ নিবারক)।

৬। কালমেঘ (জ্বরঘ্ন ও বিরেচক।

৭। ছাতিম ছাল (জ্বরঘ্ন)।

৮। অশোক ছাল (প্রদর নিবারক ।

৯। অশ্বগন্ধা (স্নায়বিক দোর্ব্বল্য নিবারক)।

১০। অনন্ত মূল (রক্তপরিষ্কারক ও বলবর্দ্ধক)।

১১। ওলট কম্বল (কষ্টরজঃ প্রতিষেধক)।

১২। পুনর্ণবা বা শ্বেতগাধমণি শাক (মূত্রকারক, শোথ নিবারক)।

১৩। বাসক ছাল (সর্দ্দি, কাশি নিবারক)।

১৪। গুলঞ্চ লতা (জ্বরঘ্ন)।

১৫। কন্টিকারী (জ্বরঘ্ন)।

১৬। ক্ষেতপাঁপড়া (জ্বরঘ্ন)।

১৭। নিমছাল (জ্বরঘ্ন ও রক্ত পরিষ্কারক)।

১৮। কুরচি বা কুটচ ছাল (রক্তামাশয় ও প্রতিষেধক)।

উপসংহার।

আমার এই 'সরল কৃষি-কথার' মধ্যে শুধু দেখাইলাম, কি করিয়া অর্থাগম হয়, কোন্ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন হয়। ইহার জন্য হয়তো অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন; কেহবা হয়তো ভাবিবেন—কি অর্থগৃধ্নু মানুষটা। নিজেও পাপ-পথে যাইতেছে; আবার অপরকেও টানিয়া লইতেছে। বাস্তবিক—যে দেশে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া ধীর-কণ্ঠে গাহিতে পারেন।

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।
নাস্তি ততঃ সুখ লেশ সত্যম্॥
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভিতীঃ।
সর্ব্বতৈষা কথিতা নীতিঃ॥"

যে দেশে সিদ্ধার্থ রাজার আলয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিলেন, আবার দেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মপরিগ্রহ করিয়া, কাঞ্চনকে লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ বলিয়া প্রচার করিলেন—সেই দেশের মানব হইয়া সেই দেশের মানবকে এরূপ অর্থনীতি শিক্ষা দিয়া লোকের নিকট আমি হেয় হইনা কেন? সেই অর্থনীতি শিক্ষা না দিয়া যে আমি তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। দেশের চতুর্দ্দিকে হাহাকার পরিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতি চর্চ্চা করিয়া অন্যান্য দেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল—আর আমরা সাহিত্য ও

দর্শন লইয়া পড়িয়া রহিলাম, অন্নাভাবেই মরিয়া গেলাম। দেশের অন্ন বস্ত্রাভাব যাহাতে দূর হয়—তাহার জন্য আমাদের সাধনা করিতে হইবে। তাই আমরা দেশবাসীকে বারম্বার বলিতেছি—হে দেশবাসী ভাইগণ, আমার দোষ দাও, ক্ষতি নাই, তবু আমার কথাগুলি শ্রবণ কর। কৃষিকে জীবনের ব্রত কর; দেখিবে অচিরাৎ তোমাদের বুকের ক্রন্দন মুখের হাসিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে; গৃহে-গৃহে অন্নপূর্ণা আসিয়া অন্ন বিলাইতেছেন। পেটে অন্ন থাকিলে ত দর্শন চিন্তা করিতে পারিবে? প্রাণপণে নূতন উদ্যমে লাগিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—লাঙ্গলই আমার বল, কৃষিই আমার উপাস্য, দেশের শস্যই আমার ইজ্জৎ—সম্মান—প্রাণ !!!

—সমাপ্ত—